দাম - ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ২০ অক্টোবর, ২০২৫।। ২ কার্তিক, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। দীপাবলী সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী সংখ্যা

৭৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ২ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২০ অক্টোবর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

প্রচ্ছদে মায়ের ছবিটি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রী মা ভবতারিণীর

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্কের প্রতীক ভাই-ফোঁটা
☐ কানুরঞ্জন দেবনাথ ☐ ৬

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ—রাজপথ থেকে লালকেল্লা
☐ কৃষ্ণানন্দ সাগর ☐ ৮

বিচারবিভাগের সদর্থক ভূমিকা পালনে সমৃদ্ধ হবে দেশ
☐ কৌটিল্য ☐ ১০

কয়েকজন নির্ভীক সাংবাদিকের কারণে নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যার কথা জেনেছে দেশবাসী ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ১১

হচ্ছেটা কী ? চলছেটা কী ? সরকার নাকি সার্কাস ?
☐ সুজিত রায় ☐ ১৪

শতবর্ষে সঙ্ঘ সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে
☐ দত্তাত্রেয় হোসবলে ☐ ১৭

বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজের আরম্ভ ও বিস্তার
☐ সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায় ☐ ১৯

বঙ্গের সঙ্ঘকাজে স্বয়ংসেবকদের বলিদান ও আত্মত্যাগের ইতিহাস
☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ২১

সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ ডাকটিকিট এবং স্মারক মুদ্রা প্রকাশ ☐ ২৩

শতবর্ষের সূচনায় মহালয়াতে তিন বঙ্গের কার্যক্রম ☐ ২৪

বউবাজার হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় কালীপূজা
☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৩১

ভারতে শক্তিসাধনার ইতিহাস (পর্ব-১)
☐ ড. অনিমেশ চক্রবর্তী ☐ ৩২

ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে শতবর্ষ যাবৎ রাষ্ট্রসেবায় রত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ☐ ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ☐ ৩৫

বিশ্বচরাচরকে সর্বদা বিপন্মুক্ত করে থাকেন মা তারা
☐ অভিজিৎ দত্ত ☐ ৪১

সঙ্ঘকাজের কণ্টকাকীর্ণ পথে বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকরা
☐ সুনীলপদ গোস্বামী ☐ ৪৩

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ☐ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

☐ **সমাবেশ সমাচার : ২৫-২৯**

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, প্রচার প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই ঁশুভ বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

—স্বস্তিকা পরিবার

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২৭ অক্টোবর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাজ্যে শাসকের সন্ত্রাস

পশ্চিমবঙ্গে আজ জনপ্রতিনিধি বিশেষত বিরোধী দলের নেতানেত্রীরা মোটেই সুরক্ষিত নন। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার হাল সহজেই অনুমেয়। এমনিতে এস আই আর-এর বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রীর উসকানিমূলক মন্তব্যে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে উত্তরবঙ্গে মানুষের কাছে ত্রাণ বিতরণে যাওয়া বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের উপর ঘৃণ্য আক্রমণের মধ্যে দিয়ে। স্বভাবতই আগামী নির্বাচনকে ঘিরে কতটা অশান্ত হবে রাজ্য তা ভেবেই আতঙ্কিত রাজ্যবাসী।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

প্রকাশিত হবে
২৭ অক্টোবর
২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শতবর্ষের সাধনা

ভারতবর্ষে শক্তিসাধনার ইতিহাস বহু প্রাচীন। দুর্গাপূজা বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠপূজা হইলেও দুর্গাকেন্দ্রিক শক্তিসাধনা অর্থাৎ অষ্টনায়িকা, নবদুর্গা, দশমহাবিদ্যা, পার্বতী, উমা, সতী, গৌরী, আদ্যাশক্তি, মহামায়া, শ্যামা, তারা, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী প্রভৃতি শক্তিদেবীর সাধনা বঙ্গদেশব্যাপী পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে শক্তিসাধনার মূল ধারা হইল মা কালী বা দেবী কালিকা। মা কালীই বঙ্গদেশে শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছেন। মা কালী বেদোল্লিখিত দেবী না হইলেও ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তকে কেন্দ্র করিয়া যে রাত্রিদেবীর উদ্ভব ঘটিয়াছে, পরবর্তীকালে তিনিই দেবী কালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বহু গষেকের ধারণা। মা কালীর প্রথম উল্লেখ রহিয়াছে মুণ্ডকোপনিষদে এবং তারপর মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীশ্রীদেবীভাগবতে। কালী সাধনায় বঙ্গীয় সাধকদিগের নাম উল্লেখযোগ্য হইলেও ভারতব্যাপী বহু শক্তিসাধক রহিয়াছেন। ভারত ভূখণ্ড জুড়িয়া শক্তিপীঠগুলিই তো ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শক্তিসাধনায় ভারতবর্ষ আত্মবলে বলীয়ান হইয়াছে। মাতৃসাধক কবি ও গীতিকারগণ রচনা করিয়াছেন শাক্ত পদাবলী। বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যগণ কালী সাধনাকে বিশ্বময় বিস্তার করিয়াছেন। শক্তিসাধক স্বামী বিবেকানন্দ পরাধীন ভারতবাসীকে শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন। স্বামীজী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা 'কালী দ্য মাদার' পুস্তক রচনা করিয়া মা কালীকে ভয় ও বিপদ হইতে মুক্তিদাত্রী দেবী হিসাবে বর্ণনা করিয়া দেশবাসীকে উজ্জীবিত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হিন্দু জাতির মনকে ভয় ও বিপদমুক্ত করিবার সাধনায় যাত্রা শুরু করিয়া এই বৎসর বিজয়াদশমীতে একশত বর্ষ পূর্ণ করিয়াছে। মহারাষ্ট্রের যুবক ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ১৯২৫ সালে এই সংগঠনের বীজারোপণ করিয়াছিলেন। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন জাতিকে আত্মবলে বলীয়ান করিয়া সংগঠিত করিতে না পারিলে দেশ ও জাতির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। তিনি কতিপয় বালক-কিশোর লইয়া সেই সাধনায় মগ্ন হইয়াছিলেন। পরাধীনতার কালে বৈদেশিক শাসকের রক্তচক্ষুকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দেশব্যাপী সংগঠনের জাল বিস্তার করিয়াছেন। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁহার দেহাবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার উত্তসূরীগণ সেই সাধনা অব্যাহত রাখিয়া সংগঠনের বিস্তারই শুধু ঘটান নাই, সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যা নিরসনে ব্রতী হইয়াছেন। ইহার ফলে সমাজকে যেমন তাহারা আপন করিয়া লইয়াছেন, তেমনই সমাজও তাহাদিগকে সর্বপ্রকার আশীর্বাদ প্রদান করিয়াছে। শতবর্ষের যাত্রাপথে দেশের ভোটভিখারি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বৈদেশিক মদতপুষ্ট অরাষ্ট্রীয় শক্তি, জেহাদি শক্তি পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু সমাজ আত্মবলে বলীয়ান হইবার ফলে তাহারা পিছু হঠিতে বাধ্য হইয়াছে।

একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, শতবর্ষের সাধনায় আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং ভারতীয় সমাজ প্রায় একাত্ম হইয়া গিয়াছে। যতটুকু অধরা রহিয়াছে তাহার জন্য সঙ্ঘ পঞ্চপরিবর্তনের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইল, জাতির জীবনে 'স্ব'-এর প্রতিষ্ঠা, পরিবার জীবনে মূল্যবোধের পুনঃস্থাপন, অস্পৃশ্যতা নির্মূল করিয়া সমরস সমাজ নির্মাণ, ব্যক্তিজীবনে যথাযথ কর্তব্য পালন এবং প্রকৃতির সংরক্ষণ করিয়া পরিবেশ-বান্ধব জীবন রচনা। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ নিজ নিজ জীবনে ইহা যথাযথ পালন করিয়া সমাজের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ইহার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবেন। আনন্দের বিষয় যে, ভারত সরকার সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের সেবাকার্য এবং দিল্লিতে ১৯৬৩ সালের সাধারণতন্ত্র দিবসে স্বয়ংসেবকদের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের চিত্র সংবলিত ডাকটিকিট এবং ভারতমাতা ও তিন স্বয়ংসেবকের চিত্র সংবলিত একশত টাকার স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করিয়াছে। এই সরকারি স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে স্বয়ংসেবকদের রাষ্ট্রসেবার সাধনায় আরও অধিক মনোবল বৃদ্ধি করিবে। সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তিতে যখন সমগ্র দেশ স্বয়ংসেবকদিগকে অভিনন্দিত করিতেছে, সর্বভারতীয় প্রচারমাধ্যম যখন বিভিন্ন কর্মসূচির ইতিবাচক সম্প্রচার করিতেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর বাজারি পত্রিকার গাত্রদাহ শুরু হইয়াছে। একটি দেশদ্রোহী, বিজাতীয় রাজনৈতিক দল এই ডাকটিকিট প্রকাশকে আক্রমণ ও সমালোচনা পর্যন্ত করিয়াছে। প্রকাশ্যে আসিয়াছে তাহাদের অরাষ্ট্রীয় চিন্তাধারা। সমাজ যখন সঙ্ঘকে আপন করিয়া লইয়াছে, তখন সামান্য অপপ্রচার রাষ্ট্রসেবায় নিয়োজিত সঙ্ঘের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিতে পারিবে না, রাষ্ট্রসাধক স্বয়ংসেবকগণ এই কথা ভালো করিয়াই জানেন।

সুভাষিতম্

অপি শাস্ত্রেষু কুশলা লোকাচার বিবর্জিতা।
সর্বে তে হাস্যতাং যান্তি যথা তে মূর্খপণ্ডিতাঃ।।

সর্বশাস্ত্রে কুশল ব্যক্তি যদি লোকাচার জ্ঞানবর্জিত হয়, তাহলে সকলেই তাকে মূর্খপণ্ডিত মনে করে হাসিঠাট্টা করে।

ভাই-বোনের চিরন্তন সম্পর্কের প্রতীক ভাইফোঁটা

কানু রঞ্জন দেবনাথ

ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া একটি সর্বভারতীয় উৎসব। এটি কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে কালীপূজার দু'দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটকে ভাইফোঁটাকে ভাইদুজ বা ভাউবিজ বলা হয়। নেপালে ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং অঞ্চলে ভাইফোঁটা ভাইটিকা নামে পরিচিত। সেখানে বিজয়া দশমীর পর ভাইটিকা সবচেয়ে বড়ো উৎসব। এছাড়া এটি যমদ্বিতীয়া নামেও পরিচিত। উত্তর ভারতে এটি ভাইদুজ নামে পরিচিত। ওড়িশায় এটি ভাইজিন্তিয়া নামে পরিচিত। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় এটি ভাগিনী হস্ত ভোজনামু নামে পরিচিত।

ভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে স্থানভেদে নীচের যে কোনো একটি মন্ত্র পড়ে বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে ছড়া কেটে তাদের ভাইদের দীর্ঘজীবন কামনা করেন। তারপর ভাইদের মিষ্টি খাওয়ায়। ভাইয়েরাও বোনদের বিভিন্ন উপহার দেয়।

১

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।।
যমুনার হাতে ফোঁটা নিয়ে যম হলো অমর,
আমার হাতে ফোঁটা নিয়ে আমার ভাই হোক অমর'।

২

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।।
যম যেমন হন চিরজীবী,
আমার ভাইও যেন হয় তেমন চিরজীবী'।।

৩

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
কাঁটা যেন নড়ে না,
ভাই যেন মরে না'।

৪

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
যম-যমুনা ভাই-বোন,
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।।

আজ অবধি ভাইরে
যমের চিন্তা নাই রে,
যম দুয়ারে দিয়ে রাখলাম কাঁটা।।'

যম ও যমুনার গল্প : কিংবদন্তী অনুসারে সূর্য ও তাঁর পত্নী সংজ্ঞার দুটি সন্তান ছিল। একজন ছিল পুত্র যম, আরেকজন কন্যা যমুনা। পুত্র ও কন্যার জন্মদানের পর সূর্যের উত্তাপ সংজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে নিজের প্রতিমূর্তি ছায়ার কাছে যম ও যমুনাকে রেখে চলে যায়। সংজ্ঞার প্রতিরূপ ছায়া হওয়ায় কেউ ছায়াকে চিনতে পারেনি। কিন্তু ছায়ার কাছে ওই দুই সন্তান কখনো মাতৃস্নেহ ও ভালোবাসা পায়নি। দিনের পর দিন ছায়া যম ও যমুনার উপর অত্যাচার করতে থাকে। অন্যদিকে সংজ্ঞার প্রতিমূর্তি ছায়াকে চিনতে না পেরে বা বুঝতে না পেরে সূর্যদেবও কোনো দিন কোনো কিছু বলেননি। যম ছায়ার অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে মনের কষ্টে নিজের যমপুরী প্রতিষ্ঠা করে এবং বোন যমুনাকে নিয়ে থাকেন। যমপুরীতে যম পাপীদের যেভাবে কঠোর শাস্তি দিতে থাকে তা দেখে যমুনা যমপুরী ছেড়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করেন। এক সময় যমুনার বিয়েও হয়। বিয়ের পরে ভাই, বোন নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যদিও যম ও যমুনা দুইজনে আলাদাভাবে থাকতে শুরু করছিলেন তথাপি ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্ক খুব মধুর স্নেহের ছিল।

এভাবেই সময় কাটছিল। এমনিতে তো যম যমুনাকে খুবই স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন, কিন্তু সময়ের অভাবে বোনের সঙ্গে দেখা করতে পারছিলেন না। একদিন কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়ার দিনে যমুনা তাঁর ভাই যমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে আসার জন্য। যমও বোনের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি বোন যমুনার বাড়িতে যাবেন। এতদিন যম মনে করতেন যেহেতু তিনি সকলের প্রাণ কেড়ে নিয়ে যান, তাই কোনো কেউই তাঁকে ভালোবেসে তাদের ঘরে ডাকেন না। কিন্তু বোন যমুনা যেহেতু যমরাজকে সদিচ্ছা নিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন; তাই তাকে ভালোবেসে সেটা পালন করা কর্তব্য। এই উপলক্ষ্যে যম বোনের বাড়ি যাবার আগে নরকে বসবাসকারী জীবদের মুক্তি দেন।

যমুনা তাঁর ভাই যমরাজকে নিজের বাড়িতে আসতে দেখে যারপরনাই খুশি হলেন। স্নান করার পর যমুনা যমের কপালে ফোঁটা দিয়ে বা তিলক পরিয়ে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেন। যমুনার এই আতিথেয়তায় যম অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বোনকে বর চেয়ে নিতে বলেন। তখন যমুনা বললেন, 'দাদা! আপনি প্রতি বছর এই দিনে আমার বাড়িতে যেন আসেন এবং আমার মতো, যে বোন তার ভাইকে এই দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাইফোঁটা দিয়ে এই দিনটিকে উদ্‌যাপন করবে তার ভাইদের আপনি অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন।' যম বললেন, তাই হবে। মানে যমরাজ নিজেও অমরত্ব লাভ করলেন এবং তার বোনকেও অমরত্বের বর দিলেন, উপরন্তু যেসব বোনেরা এই দিনে তাদের ভাইদের ভাইফোঁটা দিবে সেই বোনেদের ভাইয়েরা অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার বর দিয়ে গেলেন। সেই থেকে এই উৎসব পালনের রীতি চলে আসছে।

আরও এক পৌরাণিক কাহিনিতে বলা হয়েছে, একসময় বলির হাতে পাতালে বন্দি ছিলেন শ্রীবিষ্ণু। সেই কারণে চরম বিপদে পড়লেন স্বর্গের সব দেবতা। কোনো ভাবেই যখন বিষ্ণুকে উদ্ধার করা যাচ্ছিল না, ঠিক সেই সময় মা লক্ষ্মীর উপর সবাই ভরসা করতে লাগলেন। নারায়ণ (বিষ্ণু)-কে উদ্ধার করার জন্য লক্ষ্মী বালিকে ভাই পাতিয়ে ফেলেন। তাঁকে ফোঁটাও দেন লক্ষ্মী। সেই দিনটি ছিল কার্তিকমাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি। লক্ষ্মীর হাতে ফোঁটা পেয়ে বলি লক্ষ্মীকে উপহার দিতে চাইলে লক্ষ্মী তখন বিষ্ণুর মুক্তির উপহার চেয়ে বিষ্ণুকে বালির কাছ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যান। ভাইফোঁটা নিয়ে কৃষ্ণ ও সুভদ্রার একটি কাহিনিও শোনা যায়। অতি শক্তিশালী ও অত্যাচারী নরকাসুর পৃথিবীর সকল রাজ্য জয় করার পর স্বর্গ আক্রমণ করে। এই নরকাসুরের ভয়ে ইন্দ্র পালাতে বাধ্য হন। ইন্দ্র-সহ সকল দেবতা তখন শ্রীবিষ্ণুর কাছে গিয়ে নরকাসুরের বিনাশের জন্য কাকুতি-মিনতি করেন। বিষ্ণু তাঁদের কৃষ্ণ অবতারে সেই কাজ সমাপন করবেন বলে কথা দেন। বিষ্ণুর ভূ-দেবীকে (ভূমি দেবী) দেওয়া বর অনুসারে নরকাসুর দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা থাকাকালীন অতি দুর্ধর্ষ নরকাসুরকে বধ করেন এবং নরকাসুরের কাছে বন্দি থাকা ১৬ হাজার রমণীকে মুক্ত করে দ্বারকায় ফিরে এলে বোন সুভদ্রার আর আনন্দের সীমা থাকে না। কৃষ্ণের আদরের বোন সুভদ্রা। সুভদ্রাও কৃষ্ণকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। কৃষ্ণকে অনেকদিন পরে দেখতে পেয়ে বোন সুভদ্রা তখন কৃষ্ণের কপালে বিজয় তিলক পরিয়ে দেন। আরও একটি কাহিনিতে বলা হয়েছে চতুর্দশ শতাব্দীর পুঁথি অনুসারে জৈন মতের অন্যতম প্রচারক বর্ধমান মহাবীরের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর অন্যতম সঙ্গী রাজা নন্দীবর্ধন মানসিক ও শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েন। খাওয়াদাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হবার উপক্রম হয়েছিল। সেই সময়ে তাঁর বোন অনসূয়া নন্দীবর্ধনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে। সেখানে বোনের অনেক প্রার্থনার পরে নন্দীবর্ধন বোনের কাছে অনশন ভঙ্গ করেন। বোনের আদর ভালোবাসায় নন্দীবর্ধন খাদ্য গ্রহণ করে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

দীপাবলী শেষ হলেই শুরু হয়ে যায় ভাইফোঁটার প্রস্তুতি। ভাই-বোনের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এক বিশেষ উৎসব এই ভাইফোঁটা। এই দিন ভাইয়ের কপালে কড়ে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বোন ভাইকে ফোঁটা দেয়। সঙ্গে স্থানভেদে উপরের যে কোনো একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পরপর তিনবার মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তিনবার ফোঁটা দিতে হয়।

বোন কেন তাঁর বা হাতের কড়ে আঙ্গুল ব্যবহার করে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয় তার কারণ নারী প্রকৃতির রূপ। আর তাঁর কড়ে আঙ্গুল হলো মহাশূন্যের প্রতীক। আমাদের পাঁচটি আঙ্গুলে পঞ্চভূত তথা ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (মহাশূন্য বা আকাশ) অবস্থান করে। এই ব্যোম বা মহাশূন্য বা বিশাল আকাশ কড়ে আঙ্গুলে থাকে। এই কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ফোঁটা দেওয়ার অর্থ হলো ভাই-বোনের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা মহাশূন্যের বা বিশাল আকাশের মতো উদার, অসীম ও অনন্ত। এই জন্যই ভাই ও বোনের ভালোবাসা অটুট রাখতে এবং সম্পর্ক আরও মধুর করতে এই কড়ে আঙ্গুলে ফোঁটা দেওয়ার প্রচলন রয়েছে।

আগে কানে কণ্ঠে ফোঁটা দেওয়া দেওয়ার চল থাকলেও এখন শুধু কপালেই ফোঁটা দেওয়া হয়। কপাল আমাদের চেতনার প্রথম স্তর। তাই কপালে ফোঁটা হয়ে থাকে। এছাড়াও সাংসারিক চিন্তাভাবনায় কপাল ভাগ্যের স্থান। এই জন্য বোনেরা ভাইয়ের সৌভাগ্য কামনায় কড়ে আঙ্গুল দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে থাকে। কোনো কোনো জায়গায় কানের লতিতে টিকা দিয়ে থাকে। এর কারণ হলো কান, কান হলো শ্রবণ অঙ্গ। আর জগৎ ধ্বনিময়। সেই ধ্বনিতেই ব্রহ্মের পদধ্বনি অনুচ্চারিত হচ্ছে। ভাইয়ের কর্ণে যেন সেই ব্রহ্মধ্বনি শ্রুত হয়। অনেকে কণ্ঠেও টিকা দিয়ে থাকে। এর কারণ কণ্ঠ থেকে বাক্যের প্রকাশ, তাই বোনেরা কণ্ঠে টিকা দিয়ে থাকেন। যাতে ভাইয়ের বাক্য মধুর হয়। বাক্যই ব্রহ্ম। এই টিকা বা ফোঁটা কিন্তু শুধুই মাঙ্গলিক নয়, শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান মাহাত্ম্যেরও প্রতীক। ▫

অতিথি কলম

কৃষ্ণানন্দ সাগর

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাজপথ থেকে লালকেল্লা

এবছর ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ১০০ বছরের যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন। এর ফলে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলির বুক ধড়ফড় করতে আরম্ভ করেছে। সঙ্ঘের নাম শোনামাত্র মনে হচ্ছে যেন তাদের বিছা কামড়ে দিয়েছে আর তারা ছটফট করতে আরম্ভ করেছে। রাহুল গান্ধীর প্রপিতামহ জওহরলাল নেহরুরও বেশ কয়েক বছর এই অবস্থা ছিল। তিনিও সঙ্ঘের নাম শুনলে খুবই চঞ্চল হয়ে উঠতেন এবং সঙ্ঘকে সাম্প্রদায়িক, মুসলমান বিরোধী ও দেশদ্রোহী বলতে দ্বিধা করতেন না। শুধু তাই নয়, গান্ধীজী হত্যার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধও করেছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সঙ্ঘ সম্পর্কে অল্পবিস্তর জ্ঞান হওয়ার পর তাঁর শরীর থেকে সঙ্ঘরূপী জ্বর কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন জায়গায় যায় যে ১৯৬৩ সালের ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বিধিবদ্ধ নিমন্ত্রণ করার জন্য বিভাগীয় আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সেই অনুসারে সাধারণতন্ত্র দিবসের মাত্র তিনদিন আগে সরকারি দপ্তর থেকে দিল্লির সঙ্ঘ অধিকারীদের কাছে বার্তা আসে। এতো কম সময় হওয়া সত্ত্বেও ২৬ জানুয়ারি সকালেই প্রায় সাড়ে ৩ হাজার স্বয়ংসেবক কুচকাওয়াজ স্থান বিজয়চকে উপস্থিত হয়। সমস্ত স্বয়ংসেবকই পূর্ণ গণবেশে ছিলেন (খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা জামা, কালো টুপি ও পায়ে মিলিটারি বুটজুতা)। ঘোষ (বাদ্য)-সহ স্বয়ংসেবকরা যখন পায়ে পা মিলিয়ে রাজপথে (কর্তব্য পথ) সঞ্চলন করছেন তখন দেশি বিদেশি দর্শকেরা আশ্চর্য না হয়ে পারেননি। পরের দিন সমস্ত পত্রপত্রিকায় ছবি-সহ সেই খবর বেরিয়েছিল।

সাধারণতন্ত্র দিবসে সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এই খবর জানার পর ওই সময় কিছু কট্টর সঙ্ঘ বিরোধী কংগ্রেসির মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সমিতি'র মুখ্য নেত্রী সুভদ্রা যোশী ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে নেহরুজীর কাছে এক প্রতিনিধি মণ্ডল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু নেহরুজী তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন— সঙ্ঘকে না ডাকার তো কোনো কারণ নেই— তারা তো সকলেই দেশভক্ত। বেচারি সুভদ্রা যোশীকে মুখ কালো করে ফিরতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত নেহরুজী সঙ্ঘকে দেশদ্রোহী থেকে 'দেশভক্ত' আখ্যা কেন দিলেন সেই প্রসঙ্গ জানা দরকার।

নেহরু-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের রক্ষা : ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর নেহরুজীর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে যখন সকালে মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার জন্য ভাইসরয় হাউসে (রাষ্ট্রপতি ভবন) যাচ্ছিলেন, তখন রাজপথে প্রকাশ্যে মুসলিম লিগের লোকেরা কালো পতাকা দেখিয়ে বিরোধিতা করছিল এবং গালাগালি দিচ্ছিল। তাঁদের গাড়িতে পচা টমাটো ও ডিম ছোঁড়া হচ্ছিল, এমনকী এক লিগ সদস্য নেহরুজীর গাড়ির উপর জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ফেলছিল। এটা অত্যন্ত অপমানজনক ঘটনা ছিল। এরকম প্রায়ই হতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে দিল্লি প্রদেশের তৎকালীন কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধু গুপ্তা সঙ্ঘের দিল্লি প্রান্ত প্রচারক বসন্তরাও ওককে অনুরোধ করেন যাতে মুসলিম লিগের লোকেদের কংগ্রেসি মন্ত্রীদের উপর হামলা থেকে স্বয়ংসেবকরা রক্ষার ব্যবস্থা করে। পরের দিন ৩ সেপ্টেম্বর লিগের কিছু লোক মন্ত্রীদের উপর হামলা করতে এসে দেখে রাস্তায় আগে থেকে বেশি সংখ্যায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক উপস্থিত। প্রত্যেক লিগ সদস্যের ডানে-বামে দুজন করে স্বয়ংসেবক দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। এইসব দেখে লিগের লোকেদের কিছু করার সাহস হয়নি এবং তারা চুপচাপ চলে যায়। নেহরুজী-সহ অন্য মন্ত্রীরা নিরাপদে নিজেদের অফিসে যেতে পেরেছেন। তারপর কোনোদিন লিগের লোকেরা কংগ্রেসি মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে সাহস পায়নি।

সিন্ধে নেহরুজীকে সুরক্ষা : সিন্ধপ্রদেশের এক বড়ো শহর হায়দরাবাদ। ১৯৪৬ সালে নেহরুজীর ওখানে কোনো অনুষ্ঠান ছিল। হায়দরাবাদের কংগ্রেস নেতারা গোপনসূত্রে খবর পান যে সভাস্থলে মুসলিম লিগের লোকেরা হামলা করতে পারে এবং তাতে নেহরুজীরও ক্ষতি হতে পারে। সেখানকার কংগ্রেস নেতা চিমনদাস এবং লালা কিষণচন্দ সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের কাছে এসে নেহরুজীকে সুরক্ষা প্রদানের সহায়তা চান। ফলস্বরূপ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সভাস্থলের চারদিকে বেষ্টনী তৈরি করে। লিগের গুন্ডারা এসে দেখল যে স্বয়ংসেবকরা আগেভাগেই সভাস্থল ঘিরে রেখেছে, তখন তারা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়। সভা যথাসময়ে সম্পন্ন হয় এবং নেহরুজী নিরাপদেই ফেরত যান।

সঙ্ঘের সম্মেলনে নেহরু : ১৯৪৭ সালের ৯ মার্চ দিল্লিতে ২৫০০০ গণবেশধারী স্বয়ংসেবকের বসন্ত সম্মেলন ছিল রাজঘাটে। সন্ধ্যা ৬টায় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর প্রকাশ্য ভাষণ দেওয়ার কথা। এই উপলক্ষ্যে দিল্লির অনেক গণ্যমান্য অতিথিকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হাজার হাজার লোক সাইকেল ও অন্য যানবাহনে কার্যক্রম স্থানে আসতে শুরু করেছে। ওই স্থানের বাহন রাখার ব্যবস্থা দেখাশোনা করছিলেন একজন কার্যকর্তা— বলদেবরাজ খান্না। প্রায় ৫টা ৩০ মিনিটে সময় একজন প্রাইভেট কার নিয়ে ওখানে এলেন। সেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত নেহরু। বলদেবরাজ তাঁকে দেখে দৌড়ে গেলেন ও নমস্কার করলেন। নেহরুজী বলদেবজীকে জিজ্ঞাসা করলেন— Where is Golwalkarji, I want to see him। বলদেবজী বললেন— তিনি ঠিক ৬টার সময় আসবেন। আপনি ভিতরে বসুন। তিনি এলেই পরিচয় করিয়ে দেব। নেহরুজী বললেন, না না, তার দরকার হবে না। এতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, আমার অন্য কাজ আছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নেহরুজী বললেন— আমাকে এই কার্যক্রম স্থলের পূর্ণ দৃশ্য দেখাতে পারো? তারপর নিজেই একটা খালি বাস দেখিয়ে বললেন— ওটার ছাদে উঠলে পুরো দৃশ্য দেখা যাবে। বলদেবজীর সঙ্গে নেহরুজী বাসের ছাদে উঠলেন। চারিদিকের বিহঙ্গম দৃশ্য দেখে তিনি নেমে এলেন। ততক্ষণে তাঁর গাড়ি পার্কিং স্থানে

চলে গেছে। বলদেবজী তাঁকে গাড়ির নম্বর জিজ্ঞাসা করলেন— যাতে সামনে ডেকে আনা যায়। কিন্তু নেহরুজী এই কার্যক্রমের বিহঙ্গম দৃশ্য দেখেছেন, তার বিশালতা, অনুশাসন ও ব্যবস্থা তিনি ভালো বা খারাপ ভেবেছেন সেটা তাঁর ব্যাপার।

মানালী সঙ্ঘশাখা : ১৯৫৮-৫৯ সালের কথা। নেহরুজী কিছুদিন হিমাচল প্রদেশের মানালীতে বিশ্রামের জন্য গেছেন। বিকেলে ঘুরতে বেরিয়ে রাস্তার ধারে দেখলেন ১৫-১৬ জন বালক একটা মাঠে খেলাধুলা করছে। মাঠের এক প্রান্তে গৈরিক ধ্বজ উড়ছিল। নেহরুজীকে আসতে দেখে মাঠের বালকেরা নমস্কার করে। নেহরুজী তাদের জয়হিন্দ বলে অভিবাদন করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন— তোমরা এতো ঠাণ্ডায় কী করছো। বালকরা উত্তর দিল— আমরা এখানে সঙ্ঘের শাখা করছি। নেহরুজী এর আগে কখনো সঙ্ঘের শাখা দেখেননি। আজ এই শাখা দেখে তাঁর খুব আশ্চর্য লাগল। নেহরুজী চলে গেলেন কিন্তু তাঁর এক অনুগামী বালকদের বলল, তোমরা জয়হিন্দের বদলে নমস্কার করলে কেন? একজন স্বয়ংসেবক উত্তর দিল জয়হিন্দ ও নমস্কার দুটোর একই অর্থ। আজকাল নমস্কারই বেশি চালু। এখন শাখায় বা বিদ্যালয়ে যেভাবে বলা হয়, নেহরুজীকেও তাই বলা হয়েছে। এর মধ্যে ভুল কোথায়? উত্তরদাতার নাম ওমপ্রকাশ দীওয়ান, যে ওই সময় কুলু মহকুমার প্রচারক ছিল এবং সে ওই শাখায় উপস্থিত ছিল।

চীনা আক্রমণ : ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় সবদিকের পরাজয়ের খবর আসার ফলে নেহরুজীও ঘাবড়ে গেলেন। ক্রমাগত খবর আসছে— চীনাসৈন্যদের আক্রমণের ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে সরকারি আধিকারিকরাও পালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিজেরা সেই স্থানে অটল থেকে সবাইকে পালিয়ে যেতে নিষেধ করে। চীনের ভারতীয় দালালরা মিথ্যা রটিয়ে দেয় যে কিছুক্ষণের মধ্যে চীনা সৈন্যরা তেজপুর দখল করবে। এই গুজব বিশ্বাস করে স্টেট ব্যাংকের আধিকারিকরা কোটি কোটি টাকার নোট জ্বালিয়ে দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য তীরে এসে পৌঁছেছেন। তেজপুর শহরের অনেক প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকও নদীতীরে হাজির হয়েছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ আরও ঘাবড়ে যায়। এরকম বিষম পরিস্থিতিতে তেজপুরের স্বয়ংসেবকরা ঠিক করল তারা পালিয়ে না গিয়ে চীনা সৈন্যদের মোকাবিলা করবে। একথা ভেবে নিজেরা তো পালালো না এবং বাকিদের পালাতে নিষেধ করল। আরও ভাবল, নিশ্চয়ই কিছু লোক নিশ্চিত ভাবে নিজের বাড়িতে বসে আছে। তাদের থেকে জানা গেল যে তারা চীনা সৈনিকদের ব্যাপারে কোনো কথাই বলবে না। স্বয়ংসেবকরা ভাবল নিশ্চয়ই কোনো ষড়যন্ত্র আছে। এরপর কিছু স্বয়ংসেবক নদীর ধারে হাজির হয়। দেখে, হাজার হাজার লোক নৌকায় উঠে বসেছে। স্বয়ংসেবকরা তাদের বুঝিয়ে নৌকা থেকে নেমে আসতে বলে। কিছু লোককে জোর করে নামায়। সরকারি আধিকারিকদের জোর করে নামতে বলা হলো, কারণ তারা চলে গেলে সাধারণ লোকেদের মনোবল আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। বাকি লোকেদেরও মিনতি করা হলো বাড়িতে ফেরার জন্য। সবাইকে বলা হলো— এসবই রটনা, ভারতীয় সেনাদের ভয় পাওয়ানোর জন্য এসব রটনা করা হয়েছে। লোকেদের মনে বিশ্বাস ফিরে এলো এবং ধীরে ধীরে সবাই বাড়ি ফিরতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর বিশৃঙ্খলা থেমে গেলে এবং তেজপুরের পরিস্থিতি শান্ত হলো। এর ফলে সহজে অসম দখল করার চীনা পরিকল্পনার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এসমস্ত খবর নেহরুজীর কাছে পৌঁছে গেল। তার ফলে তাঁর মনের মধ্যে সঙ্ঘের প্রতি বিদ্বেষ অনেকটা কমে গেল। চীনের কাছে পরাজয়ের ফলে মনোবল কিছুটা উন্নত করার জন্য ঠিক হলো যে ১৯৬৩ সালের ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সমস্ত সংসদ সদস্য এবং কিছু নির্বাচিত নাগরিক অংশগ্রহণ করবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নেহরুজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্তমান সময়ের কংগ্রেসিরা এর থেকে কিছু শিক্ষা নেবেন কি? তখন ছিল সাধারণতন্ত্র দিবস, আজ স্বাধীনতা দিবস। তখন নেহরুজী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, আজ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তখন ছিল রাজপথ— আজ লালকেল্লা। তখন ১৯৬৩ সাল, আজ ২০২৫। ***(লেখক একজন ঐতিহাসিক এবং বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক)***

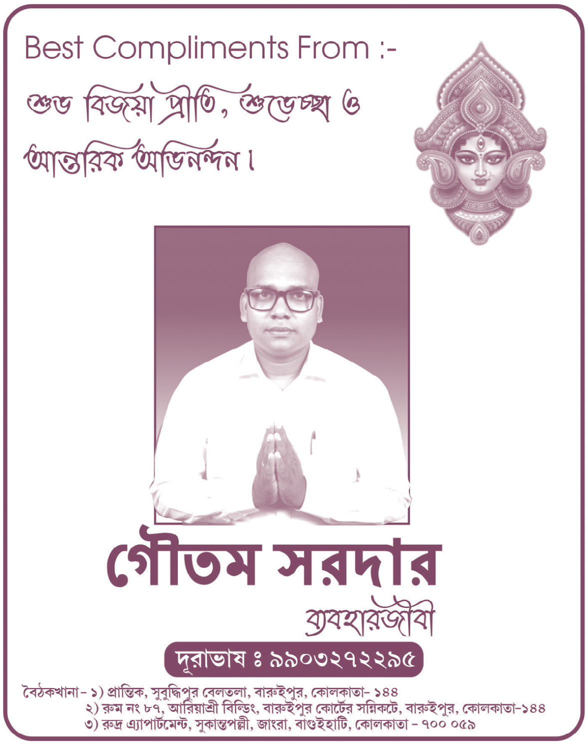

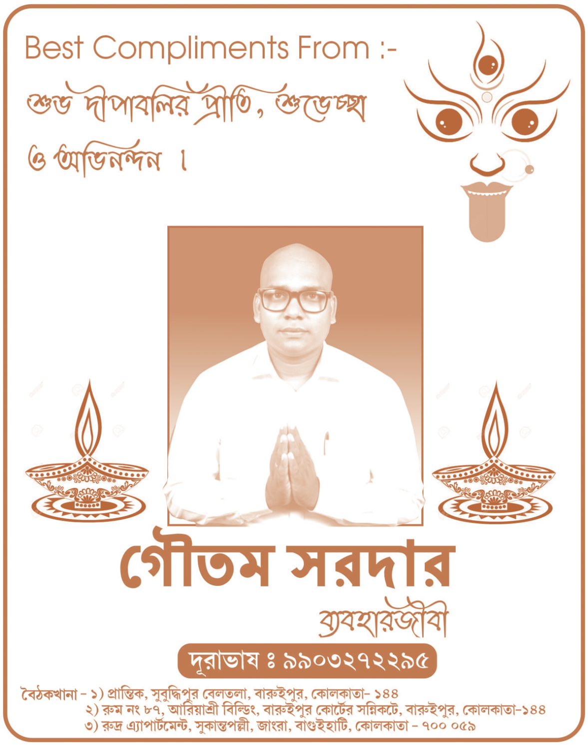

বিচারবিভাগের সদর্থক ভূমিকা পালনে সমৃদ্ধ হবে দেশ

ইসলামি শাসনে মুঘলদের আক্রমণে খাজুরাহো মন্দিরের একটি বিষ্ণুমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি সেই মূর্তিটির সংস্কারের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একটি পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন বা জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলাকালীন এই মামলাটিকে প্রথমে প্রধান বিচারপতি 'পাবলিসিটি ইন্টারেস্ট লিটিগেশন' বলে আখ্যা দিয়ে মামলাটি খারিজ করেন। এরপর তিনি একটি আপত্তিকর মন্তব্য করেন, যা হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করে। মামলাটি খারিজ করার আগে একটি অনাবশ্যক মন্তব্য করে বসেন প্রধান বিচারপতি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো, বারবার হিন্দুসমাজের নানা মামলায় একপেশে রায় দিয়েছে দেশের আদালত। এমনকী মামলা গ্রহণ করা, মামলা শোনা কিংবা রায়দানে বিরত থেকে অবিচার করা হয়েছে হিন্দুদের প্রতি। কিছু উদাগরণ দেওয়া যাক সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকেই। বিচারবিভাগের বক্তব্য হলো তারা সব ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতিকে সমানভাবে দেখে। কিন্তু কাজের সময় এর উলটো চিত্রই দেশবাসীর চোখে পড়ে। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরী পণ্ডিতদের গণহত্যার বিচার চেয়ে ২০১৭ ও ২০২২ সালে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, এই হত্যাকাণ্ডের পর বহু বছর কেটে গিয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আবেদনগুলি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। ১৯৮৪ সালে সংঘটিত শিখ গণহত্যার মামলাও বিচারবিভাগীয় শম্বুকগতির শিকার হয়।

গত দশ বছরে সংসদে পাশ হওয়া বহু আইনকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি করেছে সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে। অথচ ১৯৯৫ সালে পাশ হওয়া ওয়াকফ আইনের বলে যথেচ্ছভাবে অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকজনের জায়গা-জমি, সম্পত্তি দখল করে ওয়াকফ বোর্ড লক্ষ লক্ষ একর জমির মালিক হলেও সেই আইনটির সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হলেও, সেই মামলার শুনানি করেনি সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী দেশের সব সরকার, সরকার-পোষিত এবং বেসরকারি স্কুলে ২৫ শতাংশ সংরক্ষণ থাকে গরিব ও অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। কিন্তু এই নিয়ম থেকে বাদ রাখা হয় মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলগুলিকে। এই বিষয়ে নীরব থাকে সুপ্রিম কোর্ট। নূপুর শর্মা ইসলামি কিতাবকে উদ্ধৃত করে মন্তব্য করলে তাঁকে ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত, কিন্তু উদয়ানিধি স্তালিন হিন্দুধর্মকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করলে চুপ থাকে আদালত। হিন্দুদের পশুবলি নিষিদ্ধ, কিন্তু ইদে কোরবানির ব্যাপারেও আদালত চুপ। দুটিই তো পশুহত্যা। সবরীমালার ক্ষেত্রে মন্দিরের গর্ভগৃহে মহিলাদের প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। কিন্তু বহু মন্দিরে তো পুরুষদেরও প্রবেশ নিষেধ। মসজিদ ও দরগায় প্রবেশের ব্যাপারেও মুসলমান মহিলাদের জন্য বহু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তো সেই সব ব্যাপারে সেকুলার আদালত নীরবতা রক্ষা করে। বেআইনি সিএএ প্রতিবাদ নিয়েও চুপ ছিল সুপ্রিম কোর্ট। অযোধ্যায় কলঙ্কিত ধাঁচা ধ্বংস হলে আদালত তো মুসলমানদের বলেনি যে, এই ব্যাপারে আদালতের করণীয় কিছু নেই; কিংবা আল্লা বা বাবরকে ডাকুন।

দেশজুড়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভে ফেটে পড়ে গোটা দেশ। সামাজিক মাধ্যমে আলোড়নের পাশাপাশি মূলধারার সংবাদমাধ্যমেও সরব হয় হিন্দুসমাজ। প্রধান বিচারপতি বলেন যে, সামাজিক মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান। এর প্রতিক্রিয়ায় গত ৬ অক্টোবর রাকেশ কিশোর নামক সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রবীণ আইনজীবী প্রধান বিচারপতির দিকে জুতোও ছুঁড়ে মেরেছেন। ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক এবং একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই ঘটনার পর ওই আইনজীবীর সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ বাতিল করা হয় এবং বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তাকে বার থেকে বহিষ্কার করে। যদিও ফৌজদারি আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে ওই আইনজীবীর প্রতি 'প্রেসিডেন্সিয়াল পার্ডন'-এর নীতি গ্রহণ করেছে সর্বোচ্চ আদালত।

আজ সামাজিক মাধ্যমের যুগে মানুষের কাছে প্রতিমুহূর্তে সবরকম তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে। মানুষ ঘরে বসে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন মামলার সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পাচ্ছে। আগেকার দিনে আদালতের ভিতরে কী চলত তা মানুষ জানতেও পারত না। এখন এই প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বিচারকদের বৈষম্যমূলক কথাবার্তায়। জওহরলাল নেহরু দেশকে সেকুলার করার চক্রান্ত করলে তার বিরোধিতা করে ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেন যে, দেশ সেকুলার হলে কেন সংখ্যালঘু কমিশন থাকবে। এর ফলে নেহরু সংখ্যালঘু কমিশন রেখে, সেকুলার না করার সিদ্ধান্ত নেন।

পরে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে দেশকে সেকুলার করে দেন। বিপদ বাড়তে থাকে দেশের হিন্দুদের। ব্যাপক আকার ধারণ করে ধর্মান্তরণ। হিন্দুদের জমি ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া শুরু হয় সারা দেশে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পশ্চিমবঙ্গে। ভূমি সংস্কার এবং পরবর্তীকালে ওয়াকফ আইনের মাধ্যমে গ্রামবাঙ্গলা থেকে হিন্দুদের একপ্রকার উৎখাত করা হতে থাকে, যা এখনও তুমুলভাবে চলছে। সংবাদমাধ্যমেও এ বছর দুর্গাপূজার মধ্যেও মুর্শিদাবাদে অনেক হিন্দু ঘরছাড়া হয়েছে। দেশজুড়ে সাধারণ মানুষকে তাই অনেক সচেতন হতে হবে এবং এক্ষেত্রে সংবিধান-সহ বহু আইনের সংশোধন প্রয়োজন। আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ অন্তরায় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। □

কয়েকজন নির্ভীক সাংবাদিকের কারণে নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যার কথা জেনেছে দেশবাসী

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

এই প্রজন্মের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে নোয়াখালির ঘটনা কী? তাদের ইন্টারনেট দেখতে বলতে হবে। ওসব একটু আধটু নেটে পাওয়া যায়। ঘটনার তথ্য, তারিখ, স্থান ইত্যাদি। ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ইতিহাসের ঠিক ততখানিই তুলে ধরে, যতখানিতে 'সেকুলারদের কথায়' হিংসা ছড়ায় না। নোয়াখালির হিন্দু নরসংহার কী তবে? রুবেন চন্দ্র দাসের কবিতায় তার এক ঝলক ধরা রয়েছে—

'মানুষের সাথে মানুষের এত পশুত্ব প্রভাব
রুচির সাথে বিকৃত মন আর বিকৃত ধর্মবাসনার
যৌন সুড়সুড়ির নাম
নোয়াখালির দাঙ্গা।
হত্যা ধ্বংসযজ্ঞে নিজের মুসলমানি লিঙ্গও যে
এক বর্বর, জঘন্য, পৈশাচিক অস্ত্র
তার পরিচয় নোয়াখালির দাঙ্গা।
ধর্মবোধের টুপির সাথে স্বামী সন্তানের লাশের উপর
মুসলিম জনতার গণধর্ষণ, অতঃপর সিঁদুর মুছে ফাতেমা।
তার নাম নোয়াখালির দাঙ্গা।
চিত্তরঞ্জন দত্তের বিদ্রোহী প্রতিবাদ, অবশেষে
নিজের মাতা ও পুত্রের বুকে গুলি চালিয়ে আত্মহত্যার নাম
নোয়াখালি দাঙ্গা।
থানায় আশ্রিত হাজার হাজার নারীর ধর্ষিত দেহের
মৃত মুখে ইসলামি কলেমার চুম্বনের নাম
নোয়াখালি দাঙ্গা।
যৌনতার লিঙ্গ যেথায় ধর্মের পতাকা পেয়েছে হাতে....।'

নোয়াখালি হিন্দু নরসংহারের পর বেশ কিছু প্রতিবেদনে গান্ধীজীর ছাগল চুরির ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। নোয়াখালিতে এসেছিলেন মোহনদাস এবং তাঁর ছাগলটি চুরি যায়। আজকেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মূলধারার সংবাদমাধ্যম একবারও স্পষ্ট বলে না যে, ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর পর হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার, নির্যাতন, বলপূর্বক সম্পদ লুঠ, নারী হরণ, হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, হিন্দুদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ কী কদাকার রূপ ধারণ করেছিল। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতার হিন্দু গণহত্যারই পরিবর্ধিত সংস্করণ হলো নোয়াখালি গণহত্যা। ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬ ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া বা মূলধারার সংবাদমাধ্যম আজকেও যেমন পূর্ববঙ্গ ওপশ্চিমবঙ্গের বুকে অহরহ সংঘটিত হিন্দু নির্যাতনের ঘটনার কথা খোলাখুলি বলে না, সেদিনও বড়ো সংবাদপত্রগুলি নোয়াখালির ঘটনার কথা বিশদে বর্ণনা করতে পারেনি, তাদের বলতে দেওয়া হয়নি। সংবাদপত্রগুলি গান্ধীজীর সফরসঙ্গী ছাগল চুরি যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করলেও সুরাবর্দি পরিচালিত বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কিন্তু নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ডের তথ্য প্রকাশ্যে আনতে দেয়নি। আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন মুখ্য সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য 'নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড'-শীর্ষক পুস্তিকায় সেই লক্ষ্মীপূজার দিনে সংঘটিত বীভৎস, বিভীষিকাময় ঘটনাগুলির বিবরণ দেন। কিন্তু তারপর আর সেই আলোচনাকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারল না আনন্দবাজার। এই বইতে লেখক পরিতাপের সঙ্গে জানাচ্ছেন, ''নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইতে হইতে তৎকালীন বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের আদেশের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ৩০ মে মি. সুরাবর্দি পরিচালিত বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর কয়েকটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করেন এবং উভয় সংবাদপত্রের ৭০০০ টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়া পুনরায় ১৭০০০ টাকা নূতন জামানত আদায় করেন....।''

তাই ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর নোয়াখালি হিন্দু নরসংহার এবং তার পরের দিনগুলিতে সংঘটিত হিন্দু নির্যাতনের নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করতে আজও রীতিমতো হাতড়াতে হয়। বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহীত তথ্যগুলি বলে ওঠে এত হাজার হত্যা। তত হাজার ধর্ষণ। এত এত মানুষের বলপূর্বক ধর্মান্তরণ। ইতিহাস রচনা এবং লিপিবদ্ধ সেই ইতিহাসকে সযত্নে রক্ষার দায় চিরকালই থাকে সংবাদমাধ্যম, সাংবাদিক ও লেখকদের ওপর। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে সুরাবর্দির ওই পৈশাচিক পদক্ষেপের পর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের পর তিনি হন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৮-এর ২০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি আদেশ জারি করে পূর্ববর্তী বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আইন অনুযায়ী সংবাদমাধ্যমের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। তারপর নোয়াখালি গণহত্যার বিষয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরে তার ছবি যতটা পরিষ্কার ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয়, দু'বছর পরে সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে গেলে অনেক সূত্রই তখন হয়ে যায় হাতছাড়া, ঘটনার

বিবরণও সংগৃহীত হয় সংক্ষিপ্ত, অপর্যাপ্ত। বিশেষত যখন দেশ বিভাজনের ফলে পূর্ববঙ্গ হয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। তবুও ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেওয়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নোয়াখালির রক্তাক্ত ইতিহাসকে তথ্যযোগে ধরে রাখতে অনেকাংশে সাহায্য করেছে।

একশ্রেণীর কমিউনিস্ট লেখক ও ঐতিহাসিক নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যাকে 'গৃহযুদ্ধ' বলে চিহ্নিত করে থাকে। হিন্দু নরসংহারকে গৃহযুদ্ধ যদি বলা হয়, তবে তার চেয়ে বিকৃত বিমর্শ (ন্যারেটিভ) বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। ভারতকে টুকরো করে পাকিস্তানের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছিল। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু। জেহাদিদের দ্বারা হিন্দু গণহত্যা যে 'ওয়ার অন মাইনরিটি' সেটা স্বীকারে প্রবল আপত্তি জেহাদি-তোষণকারী কমিউনিস্টদের। পূর্ববঙ্গকে হিন্দুশূন্য করার সংকেত দিয়েছিল নোয়াখালি গণহত্যা। সেদিন সংবাদপত্রের অফিসগুলিতে স্তূপীকৃত বিবরণের এক ভাগও মনে হয় ছাপার কালিতে ব্যয় হয়নি। সম্পদ লুণ্ঠন, গৃহদাহ, ধর্মনাশ, গণহত্যা ও নারীহরণ— এই পঞ্চ বিভীষিকার নাম 'নোয়াখালি হিন্দু নরসংহার'। পঞ্চ বিভীষিকার প্রথম দু'টির তথ্য ও বিবরণ পাওয়া গেলেও শেষ তিনটির অধিকাংশ তথ্যই পরবর্তীকালে অনেক কমিয়ে, সংকুচিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে বলেই মনে করে বিশেষজ্ঞ মহল। হত্যার তথ্য যাও-বা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু নারী হরণ? কারণ, হিংস্র জেহাদিরা তখন হিন্দু পরিবারগুলিকে 'কুচি কুচি' করে ফেলেছে। হিন্দুরা হয়ে পড়েছে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। যাঁরা বেঁচে গিয়েছিলেন, তাঁরাও নারী হরণের সত্য গোপন রাখতে এবং প্রাণ বাঁচাতে উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাংবাদিকরা সত্য জানতে প্রয়াসী হলে অথবা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করলেও ভয়াবহ পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে তাঁদের পরিবেশিত সংবাদে বড়োজোর উল্লেখ করতে পেরেছেন যে, 'এই পর্যন্ত হিসেব পাওয়া গিয়াছে বা নির্ধারিত হইয়াছে'। তবে যে সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে নোয়াখালি উপদ্রব সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয়, তাতে প্রথমে বঙ্গীয় প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটিকে (এই কমিটি নিখিল ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রাদেশিক মুখপাত্র এবং কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র সম্পাদক যোগে গঠিত হয়) একটু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সরকারি আদেশে বলা হয়েছিল যে, প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি যেসব সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশে অনুমোদন দেবে, তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। এই কমিটিরও অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য। বিশেষত এই কমিটির সদস্যদের সক্রিয়তার প্রশংসা করতেই হয়, কারণ ওই অন্ধকার ও অস্থির সময়েও বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির থেকে অন্তত এইটুকু অধিকার তাঁরা আদায় করেই ছেড়েছিলেন। কিন্তু এরপরই ফের ব্যাহত হয় সংবাদমাধ্যমের কাজ। যেই নোয়াখালির মাটি থেকে সত্য সংবাদের ঝলক উঠে আসতে শুরু করল এবং তাতে স্পষ্ট অনুমোদন দিল প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি, সঙ্গে সঙ্গে সুরাবর্দি নাকচ করলেন তার সিদ্ধান্ত এবং বলবৎ করলেন কঠিন নির্দেশ। বন্ধ হলো তথ্য সংগ্রহ এবং নিয়মিত রিপোর্টিং। সুরাবর্দির চোখ রাঙানির আগেই বেশ কিছু জ্বলন্ত তথ্য-প্রমাণ রিপোর্ট হয়েছিল। ডকুমেন্টস্ এসেছিল ফিল্ড থেকে। এসেছিল হিন্দুদের হাহাকারের জ্বলন্ত ছবি! সেদিন প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি সক্রিয় ছিল বলেই হয়তো নোয়াখালির তথ্যগুলো আজও আমরা পাই।

১৯৪৬-এর ২৯ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় আইন পরিষদ বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেদিন আইনসভায় দাঁড়িয়ে মুসলমান সদস্যরা উল্লেখ করেছিল যে, মন্ত্রীমণ্ডলকে অপদস্থ করার এই যে চেষ্টা, তার ফল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভোগ করতে হবে। এছাড়াও বিশিষ্ট সাংবাদিকরা তাঁদের লেখনীতে দিয়েছিলেন পূর্বাভাস। পরিষদীয় অধিবেশনে মুসলিম লিগ মন্ত্রী মৌলবি সামসুদ্দিনের বক্তব্যে ইঙ্গিত ছিল নোয়াখালির ঘটনা ঘটানোর। তিনি তার বক্তব্যে নোয়াখালির নামে হালকা হুমকি দেন। হিন্দুদের ভীতিপ্রদর্শন করেন। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে জেহাদি উপদ্রব ঠেকাতে থানায় থানায় মিলিটারি বসানো হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে আনন্দমোহন পোদ্দার বেঙ্গল এবং ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন। কুমিল্লার কামিনী কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে হস্তক্ষেপ করার কাতর আবেদন করেন। মুসলমান সরকারি কর্মচারীরাই তখন প্রকাশ্যে হিন্দুদের ওপর দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করছে। এরই মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন বঙ্গীয় আইন পরিষদে নোয়াখালির প্রতিনিধি হারান চন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। ২৩ সেপ্টেম্বর আইনসভার আলোচনায় জেলায় জেলায় হিন্দুদের দুরবস্থার বিভিন্ন তথ্য তিনি পেশ করেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেই তথ্য প্রকাশ করে ২৩.০৯.১৯৪৬-এর অমৃতবাজার পত্রিকা। সেটাই বর্ধিত আকারে প্রকাশ করল ২৮ সেপ্টেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকা। হারান চন্দ্র ঘোষ চৌধুরীর দেওয়া তথ্যের সুবাদে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে হিন্দুদের ওপর জেহাদিদের অত্যাচারের নথি পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এরপর সুরাবর্দির টনক নড়লেও, তার আগেই সাংবাদিকরা তৈরি করে গিয়েছেন একটি সমুদ্র সমান তথ্যভাণ্ডার। পূর্ববঙ্গের অত্যাচারিত হিন্দুদের আখ্যান ততদিনে উঠে এসেছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথমসারির দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে। নোয়াখালি গণহত্যার অবিকৃত ইতিহাস, কেন হলো নোয়াখালি, কেমন ছিল নোয়াখালি, কী হয়েছিল সেদিন— সেই সবকিছু সারা বিশ্ব আজও জানতে পারে ওই হাতে গোনা কিছু হিন্দু বাঙ্গালি সাংবাদিকের জন্য, যাঁরা সংবাদজগতের টানাপোড়েনে সত্যিই দূরদর্শী ছিলেন। তাঁরা অনুমান করেছিলেন তাঁদের কলমে সুরাবর্দি বেড়ি দেবেই। তাই যত দ্রুত সম্ভব ঘটনার অবিকৃত সত্য কোথাও অন্তত জমা রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা। ঐতিহাসিক সত্য সংরক্ষণের এই গুরুদায়িত্ব মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দু সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিন নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বলেই সুরাবর্দির মারপ্যাঁচ দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করতে দেয়নি। সেদিন

তাঁরা কলম না ধরলে, দুর্দান্ত দূরদর্শিতার সঙ্গে যাবতীয় ঘটনা রিপোর্ট না করলে হয়তো গান্ধীর ছাগল চুরির তথ্যেই পূর্ণচ্ছেদ পেত নোয়াখালি।

সুরাবর্দি এতটাই ধূর্ত যে, তিনি দেখেন হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ তথ্য ও সংবাদ সচেতন। ১৯৪৬-এর ২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার সংবাদপত্র সম্পাদকদের সেক্রেটারিয়েটে ডেকে রাতারাতি এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করলেন। আওড়ালেন ভারত রক্ষা আইনের দু-চার লাইন এবং কিছু বিধি। নির্দেশ দিলেন যে, এমন সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না, যা দেশে প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তাহলে কী কী প্রকাশ করা বারণ? সুরাবর্দির নির্দেশ ছিল:

সংবাদপত্রে খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে— (১) ঘটনার স্থানের উল্লেখ করা যাবে না (পরে থানার উল্লেখ অনুমোদন পায়)। (২) ঘটনার পর মৃত অথবা আহত ব্যক্তিদের আঘাত বা মৃত্যুর কারণের উল্লেখ করা যাবে না। (৩) আক্রান্ত বা আক্রমণকারী ব্যক্তিদের আঘাত বা মৃত্যুর কারণের উল্লেখ করা যাবে না। (৪) আক্রান্ত বা আক্রমণকারী ব্যক্তিদের নাম বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাবে না। (৫) দেবস্থান বা পূজার বস্তু অপবিত্র করার বর্ণনা প্রকাশ করা যাবে না। (৬) ঘটনাস্থল বা ঘটনার কোনো ছবি প্রকাশ করা যাবে না।

এখানেই শেষ নয়, সরকারি নির্দেশ ছিল সংবাদ শিরোনামে হতাহতের সংখ্যার যেন উল্লেখ না থাকে। আরও অবাক কথা, এইসব নিষেধ সংবাদপত্রের প্রাপ্ত সংবাদের ওপরেই আরোপিত হয়, কিন্তু বেঙ্গল গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না এই বিধান। সেদিন হিন্দু বাঙ্গালি সাংবাদিকদের অনেকেই এর প্রতিবাদে বলেছিলেন যে, এতো সত্য তথ্য চাপা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। পূর্ববঙ্গের আনাচে কানাচে হিন্দুদের ওপর যে অকথ্য চলছে তা অস্বীকারের পথই তো হলো এহেন নিষেধাজ্ঞা। প্রতিবাদের ফলে সুরাবর্দি গেলেন ক্ষেপে। অত্যাচারিত হিন্দুদের সংবাদ পরিবেশনে দৃঢ়চিত্ত রইল সংবাদমাধ্যম। সংবাদপত্রে হিন্দুদের ওপর চলা হিংসা ও সন্ত্রাসের ঘটনার রিপোর্টিং প্রকাশিত হলে সুরাবর্দি যখন 'সাম্প্রদায়িক উসকানি'র অজুহাত দিচ্ছেন, তখন প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটির সাংবাদিকরা তার দিকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'আপনি (সুরাবর্দি) বলিয়াছেন সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের প্রতিক্রিয়াতেই মফস্বলে অশান্তি দেখা দিতেছে। যে সংবাদপত্রগুলি আপনরা মন্তব্যের লক্ষ্য সেগুলিতে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারের সংবাদটাই ফলাও করিয়া ছাপা হয়— ইহা আপনার ধারণা। সুতরাং ইহার প্রতিক্রিয়া যদি কোথাও দেখা দেয় তা পশ্চিমবঙ্গেই দেখা দেওয়া উচিত। পূর্ববঙ্গে দেখা দিতে পারে না। পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিতেছে তাহা যদি কিছুর প্রতিক্রিয়া হয়, উহা আপনার দলীয় মুসমিল লিগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারের কাল্পনিক সংবাদের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং দায়ী করিতে হইলে তাহাদিগকেই দায়ী করিতে হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই সকল ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে যখন কোনো প্রতিক্রিয়া নাই তখন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহকে দায়ী করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই।' হিন্দু গণহত্যার ভূমি নোয়াখালির উপকূলে থাকা হিন্দু বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তির তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, কলমের দৃঢ়তা সুরাবর্দির অত্যাচারী শাসনের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে এক সত্য হিন্দু নরসংহারের চিত্রের পাদপীঠে এনেছে সমকালীন ইতিহাসকে। সেদিন হাজার কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে একশ্রেণীর লেখক ও সাংবাদিকের অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়চেতা সাংবাদিকতার কারণে নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার প্রকৃত ইতিহাস জেনেছে দেশবাসী। □

হিন্দু গণহত্যার ভূমি নোয়াখালির উপকূলে থাকা হিন্দু বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীর দ্বারা উপস্থাপিত যুক্তির তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, কলমের দৃঢ়তা সুরাবর্দির অত্যাচারী শাসনের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে এক সত্য হিন্দু নরসংহারের চিত্রের পাদপীঠে এনেছে সমকালীন ইতিহাসকে। সেদিন হাজার কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে একশ্রেণীর লেখক ও সাংবাদিকের অনমনীয় মনোভাব ও দৃঢ়চেতা সাংবাদিকতার কারণে নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার প্রকৃত ইতিহাস জেনেছে দেশবাসী।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

হচ্ছেটা কী ? চলছেটা কী ? সরকার নাকি সার্কাস ?

দেশের মধ্যে বহু রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাথা নীচু হয়েছে আগেই। এখন অভয়া হত্যা, ল' কলেজে ধর্ষণ আর ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি যাবার পর বিদেশের কাছেও রাজ্যের সম্মান ভূলুণ্ঠিত।

সুজিত রায়

আমাদের ছোটবেলায় একটা নাটকের মঞ্চাভিনয় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নাটকটার নাম ছিল 'হচ্ছেটা কী ?' তৎকালীন সমাজের চোখে চোখ রেখে নাট্যকার এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা জানতে চেয়েছিলেন— আর কবে ? আর কবে ? আর কবে ? আর কবে সংশোধিত হবে সমাজ ? আর কবে সংশোধিত হবে রাজনীতি ? আর কবে সংশোধিত হবে মানবিকতা ? মূল্যবোধ ?

সে তো কোন কালের কথা। ইতিমধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর বুক দিয়ে ভেসে গেছে বহু তরঙ্গ। কিন্তু আজও মানুষের মুখে মনে সেই একই প্রশ্ন— হচ্ছেটা কী ?

হ্যাঁ, আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি। তাও মহাভারত লিখতে বসিনি বলে শুধু শিক্ষা নিয়েই তুলছি প্রশ্নটা— হচ্ছেটা কী ?

একটা ছোট্ট হিসেব দিই। ২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার। এক বছরের মধ্যে ২০২১ সালে সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো একানব্বই। পরের বছর ২০২২ সালে আরও প্রায় চার হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। সংখ্যাটা দাঁড়ায় এক লক্ষ চোদ্দ হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ। এইভাবে বন্ধ হতে হতে এই মুহূর্তে রাজ্যের আট হাজার দুশো সাতটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলি বন্ধ হওয়ার কারণ, স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার গড় ভর্তির সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছিল তিরিশ। সরকারিভাবে বলা হচ্ছে এত কম ছাত্র নিয়ে স্কুল চালানো খুব শক্ত হয়ে উঠছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, ছাত্র-ছাত্রী নেই— এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির ওপর চাপ বাড়ছে। অগত্যা হিসেব করে দেখা গেছে রাজ্যের স্কুলগুলি অন্তত দশ শতাংশ স্কুল বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক রিপোর্টের তথ্য বলছে— ওই বছর প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির সংখ্যা ছিল নয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো সাতাত্তর। প্রাথমিকে ভর্তি হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার দুশো আটানব্বই জন। ঠিক পরের বছরেই দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে হয় যথাক্রমে আট লক্ষ সাতান্ন হাজার সাতশো ছিয়াশি এবং চুয়াল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার পঞ্চান্ন জন। অর্থাৎ কম-বেশি দুটি ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা কমেছে এক লক্ষেরও বেশি।

ভর্তির সংখ্যা কমছে মাধ্যমিক স্তরেও। ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ভর্তির সংখ্যা ছিল সাতাশ লক্ষ বারো হাজার তিনশো বাহাত্তর। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সংখ্যা ছিল পনেরো লক্ষ বাহাত্তর হাজার একষট্টি জন।

সম্প্রতি একটি সংবাদ পোর্টাল এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০২৩ সালের এই প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, দক্ষিণ কলকাতার কসবা মডার্ন ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস স্কুলে সাতজন শিক্ষক আছেন, একজন ছাত্রীও নেই। রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত এমনই দুশো তিপান্নটি স্কুলের বেঞ্চগুলি পড়ে থাকে শূন্য অবস্থায়। কালচিনি ও আলিপুরদুয়ার চা বাগিচা এলাকায় সাঁইত্রিশটি সরকারি স্কুল বন্ধের মুখে। সোদপুর সুশীলকৃষ্ণ শিক্ষায়তনে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল তেরো। ছাত্র ছিল পাঁচ। তথৈবচ অবস্থা কলেজগুলিরও। সরকারি কলেজগুলি খাঁ খাঁ করছে ছাত্র-ছাত্রী শূন্যতায়। চলতি বছরে সামগ্রিক ভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কমে গেছে।

অথচ বিস্ময়কর তথ্য হলো— পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১১ সালের পর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামুখী করে তোলার জন্য ঢালাও আর্থিক ভাতা দানের যোজনা চালু করেছে। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। যেমন কন্যাশ্রী প্রকল্প। এই প্রকল্পে তেরো থেকে আঠারো বছর বয়সি ছাত্রীদের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার ভাতা দেওয়া হয়। দেওয়া হয় বিনামূল্যে সাইকেল, স্কুল ইউনিফর্ম, পাঠ্যবই। সব স্কুলে দেওয়া হয় ভালো ভালো ডিমের তরকারি সেও বিনামূল্যে। শর্ত হচ্ছে, স্কুলের খাতায় মেয়েদের নাম থাকতে হবে। দিতে হবে নিয়মিত হাজিরা। অথচ সরকারি হিসেবে ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ছ' লক্ষ নিরানব্বই হাজার যা ২০২২ সালের তুলনায় প্রায় চার লক্ষ এবং ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কম। তর্কের খাতিরে অনেক বলেন— ২০২১, ২০২২ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম হওয়ার কারণ

করোনা মহামারী। হয়তো তা সত্যি। কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সত্যিটা হলো— কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাওয়ার জন্য ছাত্রীদের নাম লেখা আছে স্কুলের খাতায়। কিন্তু কোনোদিনই নিখুঁতভাবে সমীক্ষা হয়নি, যে সেই সব ছাত্রীর আদৌ অস্তিত্ব আছে কিনা? তারা আদৌ স্কুলে হাজির থাকে কিনা? অথবা তাদের নাবালিকা অবস্থাতেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা। অঙ্কের গরমিলটা বেশ কয়েকটি বেসরকারি সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। খাতায় নাম আছে, কন্যাশ্রীর টাকাও তোলা হচ্ছে। কিন্তু আদতে ছাত্রীটিকে কেউ কোনোদিন চোখে দেখেনি।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১৫-১৬ সাল থেকে সবুজ সাথী প্রকল্পে বিনামূল্যে সাইকেল দেওয়া শুরু হয়। চলতি বছর পর্যন্ত মোট তেতাল্লিশ লক্ষ সাইকেল বিনামূল্যে বিতরণের লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। অথচ শহরে গ্রামে একটু হেঁটে দেখুন— দেখতে পাবেন সেই সাইকেল চেপে চলেছেন বাড়ির অন্য কেউ— ছাত্র-ছাত্রীরা নয়। কারণ ছাত্রীরা স্কুলে যায় না। তারা 'কাজের মাসি' হিসেবে অন্য বাড়িতে নিযুক্ত মায়েদের সাহায্য করে অথবা মায়ের অনুপস্থিতিতে ছোটো ভাই-বোনদের বাড়িতে দেখাশোনা করে। ছাত্রদেরও সাইকেল লাগে না। কারণ তারাও স্কুলছুট। তারা যায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাশ্মীরে আপেল বাগানে কাজ করতে, নয়তো বিহারে পাথর ভাঙতে। অথবা বেঙ্গালুরু বা নয়ডার মতো ক্রমবর্ধমান শহরে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতে। নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে সরকারের দেওয়া ট্যাব বা মোবাইল আছে, আছে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডও। তবু তারা স্কুলছুট। কারণ, তারা জানে, 'বাজারে চাকরি নাই, পড়াশোনার পাট নাই।' সবচেয়ে বড়ো কথা, এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় না। কারণ এরা স্কুলে হয় মোবাইল নম্বর দেয় না, অথবা ভুল নম্বর দিয়ে রাখে।

কিন্তু স্কুল ছুটের সংখ্যা কেন এত বেশি? এত টাকা বিলি করার পরেও হচ্ছেটা কী?

অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কারণ দুটি :

(১) নাবালিকা কন্যারা কন্যাশ্রীর টাকা নিয়ে প্রেমিকের হাত ধরে ঘর ছাড়ছে। নয়তো গরিব বাবা-মা ধরে বেঁধে যেভাবে হোক মেয়ের বিয়ে দিয়ে কর্তব্য সারছেন।

(২) টাকা উঠছে। কন্যা নেই। কার ধনে কে পোদ্দারি করছে তা দেখার মালিক নেই।

ঠিক যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ভূতে খাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় গাড়ি ছাড়া রাস্তায় বেরোন না। মুখে সুগন্ধী পান, পরনে দামি গরদের শাড়ি, সর্বাঙ্গে ঝলমলে সোনার অলঙ্কার সমৃদ্ধ মধ্যবয়সি এবং প্রৌঢ়া মহিলারাও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নাম লিখিয়েছেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন— সরকার দিচ্ছে, তাই নিচ্ছি। একই উত্তর পাবেন পেনশন বা ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের তথ্য গোপন রেখে যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বার্ধক্যভাতা পাচ্ছেন, তাদের মুখ থেকেও— সরকার দিলে নেব না?

কোটি কোটি টাকা, ভুল হলো। হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতিদিন, প্রতিমাসে দিনেদুপুরে লুট হচ্ছে। সরকারি মদতে। অথচ রাজ্য জুড়ে রাস্তা পরিণত হচ্ছে চন্দ্রপৃষ্ঠে। মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে সব রোগের চিকিৎসা মেলে না, স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রী মেলে না। মিড ডে মিলে ডিম মেলে না। কিন্তু 'শ্রী'পদবিধারী সামাজিক প্রকল্পগুলি

দুদ্দাড় করে এগোয়।

থাক সে কথা। আসল কথায় আসি। মেয়েদের কথায়। আপনি জানেন কি? নাবালিকা বিবাহে গোটা ভারতবর্ষে এখন শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ? একেবারে ফার্স্ট। সংখ্যাটা কত? ৫৪.৯ শতাংশ। জাতীয় গড় যেখানে মাত্র ২৯.৫ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক নাবালিকার ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ে হওয়া, মা হওয়া লজ্জাজনক নয় কি? বিশেষ করে যেখানে জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকা বাপের জমিদারির মতো বিলি করা হয় সামাজিক উন্নয়নের নামে? কীসের স্বার্থে? কার স্বার্থে? প্রশ্ন উঠবে না?

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে একটা উদ্ধৃতি দিই— 'কাল থেকে স্কুলে আসব না' শীর্ষক প্রবন্ধ (লেখক : সন্দীপন নন্দী)-এ লেখা হয়েছে— 'সে ছিল এক আশ্চর্য রোল কলের খাতা। খুলতেই চোখে পড়ে, ক'জন ছাত্রীর নামের পাশে ফাঁকা ঘরে জ্বলজ্বল করছে সদ্য লেখা কিছু কথা। এক ছাত্রী গোটা গোটা হরফে লিখেছে, 'পড়ালেখা ছেড়ে দিলাম, কাল থেকে আর স্কুলে আসব না।' কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? রোল নং ২৩ গোটা গোটা হাতের লেখায় স্বীকারোক্তি দিয়েছে, 'মা হতে চলেছি, স্কুল আসব কী করে?' ...রোল নং-৪২-এর দ্বিধাহীন কলমে লেখা ছিল— 'কীর্তনে মাথুর গাই, সিজিন চলছে। দিনে দুশো দেয়। স্কুলে এলে বাবার চিকিৎসার খরচ মা একা চালাতে পারবে না।'

এখানেই শেষ নয়, সন্দীপন নন্দী লিখছেন : ''কন্যাশ্রী প্রকল্পের নিয়ম, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া অবিবাহিত কন্যারা কে-টু ফর্মে আবেদন করলে এককালীন ২৫ হাজার টাকা পেতে পারে। সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় অবিবাহিত থাকার শংসাপত্র। কিন্তু হায়! খবর আসে, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা কাউন্সিলররা চোখ বুজে সই করে দিচ্ছেন যে শংসাপত্রে। অবশ্যই তার কিছু বিনিময় মূল্য রয়েছে— বিভিন্ন অঞ্চলে নাকি ২৫ হাজার টাকার আধাআধি বখরায় রাজি হয়ে যাচ্ছে ছাত্রীর পরিবার। ফলাফল? অকালমাতৃত্ব ঘনিয়ে আসা নবম শ্রেণীর ছাত্রী, পড়াশোনা ছেড়ে পার্লার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজে নিযুক্ত দশম শ্রেণীর উজ্জ্বল মেয়ের গোপন বিয়ের বার্তা রটে যায় ক্রমে। ...সমীক্ষায় জল মেশে প্রতিদিন।'' কিন্তু অকালে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে প্রসূতির মৃত্যুকে ধামাচাপা দেবে কীভাবে? তাই হিসেব মিলে যায়। যত নাবালিকা স্কুল ছুট, যত নাবালিকার অকাল বিবাহ এবং অকাল মাতৃত্ব, ততই প্রসূতির অকাল মৃত্যু। হিসেব মতো মৃত প্রসূতিদের প্রতি চারজনের একজনই নাবালিকা। ধন্য রাজ্যের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রকল্প!

ফের ফিরে আসি স্কুল বন্ধের কথায়। পশ্চিমবঙ্গে এখন স্কুল আছে খাতায়, স্কুল ভবন নেই। স্কুলে শিক্ষক আছেন অনেক, ছাত্র নেই। কোনো স্কুলে ছাত্র আছে, শিক্ষক নেই। একটি সংবাদমাধ্যমের দ্বারা সমীক্ষা অনুযায়ী সমীক্ষায় রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদে ভ্যাকেন্সির সংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। এর মধ্যে উনসত্তর শতাংশই গ্রামীণ এলাকায়। স্কুল বন্ধ হচ্ছে— সেখানে তৈরি হচ্ছে বেসরকারি আবাসন— রিয়েল এস্টেট। উদাহরণ, দমদমের অমৃতলাল ওঝা বিদ্যামন্দির। আবার সংখ্যাতত্ত্বের মজা দেখুন— কুলতলী মডেল স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ২২। শিক্ষকের সংখ্যা আট। ছাত্র-শিক্ষকের গড় অনুপাত হলো কত? ২.৭৫ : ১। প্রতি একজন ছাত্রের পিছনে প্রায় তিনজন শিক্ষক। দারুণ ব্যাপার! উলটোটাও দেখে নিই— দক্ষিণ ২৪ পরগনারই নারায়ণপুর হাই স্কুলে ছাত্রসংখ্যা দু হাজার। শিক্ষকের সংখ্যা ২৪। গড় অনুপাত? ৮২.৪১ : ১। অর্থাৎ প্রতি সাড়ে বিরাশিজন ছাত্রের জন্য বরাদ্দ একজন শিক্ষক। আর যদি পরিকাঠামোর কথা ধরি সেখানেও মহাজাগতিক বিশৃঙ্খলা। কলকাতায় প্রতি ৩৫ জন ছাত্রের জন্য বরাদ্দ একটি ক্লাসরুম। কিন্তু মুর্শিদাবাদে একটি ক্লাসরুম বরাদ্দ ১১০ জনের জন্য।

'Poor Econonics'-এর পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলে থাকেন, গরিব মানুষের হাতে কাঁচা টাকার প্রয়োজন। গরিবের হাতে টাকা থাকলে তার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বেঁচে থাকার রসদ পান তাঁরা। নোবেল বিজয়ী দুই বাঙ্গালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এবং অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কি সত্যিই বলেছিলেন— নগদ নারায়ণ দু'হাতে বিলি করে বেড়ান কোনো সমীক্ষা ছাড়াই? তাঁরা কি বলেছিলেন, মহিলা হলেই তাঁর হাতে তুলে দিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার? তাঁরা কি আদৌ বলেছিলেন, রাজ্যের দুর্গাপূজার উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দিন বছর বছর কোটি কোটি টাকা? দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে, ২০২৫ সালে তা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। শুধু টাকার লোভে লাফিয়ে লাফিয়ে সাত বছর আগের ২৮ হাজার পূজা বেড়ে এবারে হয়েছে ৪৩ হাজার। আর এই বছরে বিলি হচ্ছে ৪৭৩ কোটি টাকা। অমর্ত্য সেন বলেছিলেন? অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন— কন্যাশ্রী প্রকল্প সমীক্ষা না করে টাকা দিতে? টাকা দেওয়ার পর ঠিকঠাক সমীক্ষা না করতে? অথচ গত ১৪ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত সরকারের আমলেই প্রায় ৭ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চার কোটি বেকারের কাজ হয়েছে বলে যা দেখানো হচ্ছে সবটাই ওই কন্ট্রাকচুয়াল জব— সিভিক পুলিশ বা স্বাস্থ্যসেবকের চাকরির মতো। নতুন কলকারখানা খুঁজতে হলে মাইক্রোস্কোপ দরকার। অথচ চোখের সামনে গুজরাট এগোচ্ছে, বেঙ্গালুরু এগোচ্ছে, দিল্লির উপকণ্ঠ নয়ডা, গুরুগ্রাম এগোচ্ছে, এমনকী বিহার, ওড়িশাও এগোচ্ছে ঝড়ের গতিতে— শিক্ষায়, শিল্পে, স্বাস্থ্যে। সামাজিক সচেতনতায়, সামাজিক মূল্যবোধে।

গোটা দেশে প্রতিদিন হই হই করে পিছোচ্ছে একটিই রাজ্য— পশ্চিমবঙ্গ। দেশের মধ্যে বহু রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মাথা নীচু হয়েছে আগেই। এখন অভয়া হত্যা, ল' কলেজে ধর্ষণ আর ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি যাবার পর বিদেশের কাছেও রাজ্যের সম্মান ভূলুণ্ঠিত। এসব দেখেও কি বলব না— হচ্ছেটা কী? চলছেটা কী? সরকার? নাকি সার্কাস? □

শতবর্ষে সঙ্ঘ সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছে

দত্তাত্রেয় হোসবলে

যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার শতবর্ষের যাত্রা পূর্ণ করছে, তখন এই বিশেষ মুহূর্তটিকে সঙ্ঘ কীভাবে উপলব্ধি করে তা নিয়ে জনমানসে একটি স্পষ্ট কৌতূহল রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সঙ্ঘের কাছে এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের অনুষ্ঠান নিছক উদ্‌যাপনের বিষয় নয়, বরং আমাদের আত্মবিশ্লেষণ এবং উদ্দেশ্যের প্রতি পুনরায় নিবেদিত হওয়ার একটি সুযোগ। আন্দোলন পরিচালনায় যেসকল অদম্য সাধু ব্যক্তিত্ব নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের অবদান রেখেছেন, এই মাহেন্দ্রক্ষণ তাঁদের স্বীকৃতি জানানোরও একটি সুযোগ। সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্মবার্ষিকীর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান শুধু ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার সংকল্পে শতবর্ষের যাত্রাকে ফিরে দেখা। উদ্দেশ্য বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি। ডাঃ হেডগেওয়ার ছিলেন একজন আজন্ম দেশপ্রেমিক। ভারতের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা এবং নিখাদ নিষ্ঠার এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁর আশৈশব কর্মকাণ্ডেই স্পষ্ট ছিল।

তিনি কলকাতায় চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করতে প্রয়াসী তিনি তখন থেকেই। এজন্য সশস্ত্র বিপ্লব থেকে সত্যাগ্রহ— সমস্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি।

সঙ্ঘ মহলের প্রিয় ডাক্তারজী এই দুই পথের কোনোটিকেই ছোটোভাবে দেখার চেষ্টা করেননি। তৎকালে আলোচনার মূল বিষয় ছিল সামাজিক সংস্কার বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। একইসঙ্গে, ভারতীয় সমাজের একজন চিকিৎসক হিসেবে আমাদের স্বাধীনতা হারানোর কারণগুলিও তিনি খুঁজে বের করেন এবং সেসবের স্থায়ী সমাধান দিতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বহিরাগত আক্রমণকারীদের ভারতে অনুপ্রবেশের কারণ ছিল একাধিক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৈনন্দিন জীবনে দেশপ্রেমের অনুপস্থিতি এবং জাতীয় চরিত্রের সার্বিক অবক্ষয়। তার ফলে তৈরি হয়েছিল সংকীর্ণ পরিচয় এবং সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলার দীনতা। তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, অবিরাম

আগ্রাসনের কারণেই আমাদের গৌরবময় ইতিহাস দেশবাসী বিস্মৃত হয়েছে। তাই আমাদের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের জগতের ঐতিহ্য সম্পর্কে তৈরি হয়েছিল হতাশা। আমাদের গ্রাস করেছিল হীনম্মন্যতার অনুভূতি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সামান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সক্রিয়তা প্রাচীন ভারতের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে না। তাই তিনি জাতির উত্থানে মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ধারবাহিক প্রচেষ্টা নেন। রাজনৈতিক সংগ্রামের বাইরে এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনার ফলাফল হলো— সঙ্ঘের 'শাখা পদ্ধতি' ভিত্তিক উদ্ভাবনী এবং অনন্য কর্মকাণ্ড।

ডাঃ হেডগেওয়ার নিজে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। অন্যদেরও তাতে উৎসাহিত করেন। তার পাশাপাশি তিনি সমাজের মধ্যে কোনো সংগঠন গড়ার বদলে সমগ্র সমাজকে সংগঠিত করার জন্য এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিটি তৈরি করেন। আজ শতবর্ষ পরেও হাজার হাজার যুবক ডাঃ হেডগেওয়ারের দেখানো পথে যোগ দিচ্ছেন। জাতীয় স্বার্থে নিজেদের উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত তাঁরা। সঙ্ঘের প্রতি সমাজের গ্রহণযোগ্যতা এবং সঙ্ঘের কাছে প্রত্যাশা ক্রমশ বাড়ছে। এগুলি ডাক্তারজীর ভাবনা এবং কর্মপদ্ধতিকে অনুমোদন বই কী।

এই আন্দোলন ও দর্শনের প্রগতিশীল বিকাশ একটি অলৌকিক ঘটনা থেকে কম নয়। ইংরেজি-শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর বেশিরভাগ মানুষ যখন সংকীর্ণ ইউরোপীয় জাতীয়তাবোধের ধারণায় প্রভাবিত তখন 'হিন্দুত্ব' এবং 'রাষ্ট্র'-এর ধারণা ব্যাখ্যা করা সহজ ছিল না। ডাঃ হেডগেওয়ার আদর্শকে তত্ত্বের মোড়কে আবদ্ধ করেননি। কিন্তু তিনি বীজবপনের মতো করে একটি 'অ্যাকশন প্রোগ্রাম' সামনে এসেছেন। ওই যাত্রায় সেটাই হয়ে উঠেছে পথপ্রদর্শক শক্তি। তাঁর জীবদ্দশায়, সঙ্ঘের কাজ ভারতময় হয়ে গিয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগের মতো দুর্ভাগ্য যুগপৎ ঘটে যায়। তখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা পাকিস্তান থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে উদ্ধার এবং সসম্মানে তাঁদের পুনর্বাসন দিতে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। 'সংগঠনের স্বার্থে সংগঠন' মন্ত্রটি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি সঞ্চার করেছিল। স্বয়ংসেবকরা সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধের ধারণা শিক্ষা থেকে শুরু করে শ্রম, রাজনীতি পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে দেখাতে থাকেন। জাতীয় নীতিমালার আলোকে সবকিছু পুনর্গঠন করতে এই পর্যায়ে পথপ্রদর্শক শক্তি হয়ে ওঠেন দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর)। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার, মানবতার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব রয়েছে। ভারতকে সর্বজনীন সম্প্রীতি এবং একতার ধারণার উপর ভিত্তি করে ভূমিকা পালন করতে হলে জনগণকে সেই লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

শ্রীগুরুজী এজন্য একটি শক্তিশালী আদর্শগত ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু সমাজের সংস্কারবাদী অ্যাজেন্ডা নতুন গতি লাভ করে যখন ভারতের সকল সম্প্রদায় ঘোষণা করে যে, হিন্দুদের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্যের কোনো ধর্মীয় অনুমোদন নেই। জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের উপর নির্মম আক্রমণ নেমে আসে। তখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে স্বয়ংসেবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শাখার ধারণা থেকে সঙ্ঘ বিস্তারলাভ করেছে। সমাজের ধার্মিক শক্তিকে আহ্বান করেছে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে। গত ১০০ বছরে সঙ্ঘের এই অগ্রগতি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তির মতো আন্দোলনগুলি ভারতের সকল অংশ এবং অঞ্চলকে সাংস্কৃতিক মুক্তির পক্ষে সংযুক্ত করেছে। জাতীয় নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে গ্রামোন্নয়ন— জাতীয় জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে স্বয়ংসেবকরা ছুঁয়ে যাননি। সবচেয়ে খুশির খবর হলো, এই পদ্ধতিগত রূপান্তরের অংশ হতে স্বয়ং সমাজই এগিয়ে আসছে।

যদিও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখার প্রবণতা রয়েছে, তবুও সঙ্ঘ এখনও সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং ডানপন্থী মানুষ ও সংগঠনের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরির উপর মনোনিবেশ করছে। সামাজিক রূপান্তরে নারীর অংশগ্রহণ এবং পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা পুনরুদ্ধার সঙ্ঘের লক্ষ্য। সঙ্ঘ লোকমাতা অহল্যাবাঈ হোলকরের ত্রি-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ডাক দিয়েছে। তাতে ভারতজুড়ে হাজার দশেক অনুষ্ঠান হয়েছে। সব মিলিয়ে যোগ দেন ২৭ লক্ষাধিক নরনারী। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে আমাদের ন্যাশনাল আইকনদের সম্মিলিতভাবে সম্মান প্রদর্শনের সাক্ষ্য দেয়। শতবর্ষে পা দিয়ে জাতি গঠনে সঙ্ঘের কর্মকাণ্ড তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত এক বছরে দশ হাজার শাখা যোগ করা গিয়েছে। এই ঘটনা নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের প্রতীক। প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় পৌঁছনোর লক্ষ্য এখনো পূরণ হয়নি। বিষয়টি নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। পঞ্চ-পরিবর্তনের আহ্বান— অর্থাৎ রূপান্তরের জন্য পঞ্চ-স্তরের কর্মসূচি— আগামী বছরগুলিতেও মূল লক্ষ্য থাকবে। সঙ্ঘ শাখা সম্প্রসারণের জন্য **নাগরিক কর্তব্য, পরিবেশ-বান্ধব জীবনযাপন, সামাজিক সমরসতা, পারিবারিক মূল্যবোধ** এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে **স্ব-এর অভিব্যক্তির** উপর জোর দিয়েছে। দেখতে হবে প্রত্যেকেই যাতে 'পরং বৈভবং নেতুমেতৎ স্বরাষ্ট্রম্'-এর বৃহত্তর উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারেন। এর অর্থ হলো— আমাদের দেশকে সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে দিতে হবে।

গত একশো বছরে, জাতীয় পুনর্গঠনের আন্দোলন হিসেবে সঙ্ঘ অবহেলা ও উপহাস থেকে কৌতূহল ও গ্রহণযোগ্যতার দিকে যাত্রা করেছে। সঙ্ঘ কারও বিরোধিতায় বিশ্বাস করে না। তারা বরং আত্মবিশ্বাসী যে, আজ যাঁরা সঙ্ঘের কাজের বিরোধিতা করছেন তাঁরাই একদিন সঙ্ঘের বৃত্তে প্রবেশ করবেন। বিশ্ব যখন জলবায়ু পরিবর্তন থেকে শুরু করে হিংসাশ্রয়ী সংঘাত-সহ পর্যন্ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন ভারতের প্রাচীন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অনবদ্য সমাধানের রাস্তা বলে দিতে পারে। এই বিশাল কিন্তু অনিবার্য কাজটি তখনই সম্ভব যখন ভারতমাতার প্রতিটি সন্তান এই ভূমিকাটি বুঝবেন এবং এমন একটি দেশীয় মডেল তৈরিতে নিজ নিজ অবদান রাখবেন— এগুলি অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের সবাই বিশ্বের সামনে একটি সুসংগঠিত ও ছন্দোবদ্ধ ভারতের আদর্শ উপস্থাপন করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্যোগ সমগ্র সমাজকে সজ্জন শক্তির নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের আরম্ভ ও বিস্তার

সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায়

আজ ভাবতেও অবাক লাগে যে অবিভক্ত বঙ্গের রাজধানী কলকাতায় সর্বপ্রথম সঙ্ঘশাখা শুরু হয় ১৯৩৯ সালে শ্রীগুরুজীর উপস্থিতিতে, সরকার লেনের হিন্দু মহাসভার অফিসের মধ্যে। সেবার (১৯৩৯) শ্রীগুরুজীর চেষ্টায় ৮ জন স্বয়ংসেবক কলকাতা থেকে সেই প্রথম নাগপুরে ওটিসি করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন ফিরে আসেন কলকাতায়। ডাঃ হেডগেওয়ারের সামনে ৬ জন স্বয়ংসেবকের 'প্রতিজ্ঞা' হয়েছিল আমহার্স্ট স্ট্রীট ও কেশব সেন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ঘরে (বর্তমানে অবলুপ্ত) এদের মধ্যে ছিলেন সুশ্রুত মুখার্জি (তদানীন্তন কার্যবাহ ডাঃ সন্তোষ মুখার্জির ছেলে) ও দেবদাস চ্যাটার্জি। সেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংসেবকদের মধ্যে জয়দেব ঢোলে (ঘোষ) ও বঙ্কিম ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাক্তারজী কলকাতায় আসেন বীর সাভারকারের হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে যোগদানের জন্য। কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে ডাক্তারজী এই সময়েই মানিকতলা শাখায় (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের ঘেরা মাঠে) কয়েকজন সহকর্মীসহ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবালাসাহেব দেওরস ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৪০ সালের ওটিসি পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা তথা বঙ্গের কাজ দেখাশোনা করতেন। তাঁর সঙ্গেই ১৯৪০ সালে ওটিসি দ্বিতীয় ব্যাচ কলকাতা থেকে নাগপুরে যায়। এই ব্যাচের মধ্যে বর্তমানে প্রদেশের প্রান্ত সঙ্ঘচালক কালিদাস বসু, জ্ঞানেশ সান্যাল (গোরাদা) ও বঙ্কিম ঘোষাল ছিলেন। ১৯৪০ সালের নাগপুর ওটিসি-তে শেষদিনে গোরাদা বঙ্গপ্রদেশের 'প্রতিনিধিত্ব করেন, বাংলাভাষায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। গোরাদা কয়েকবছর আগেই স্বর্গগত হয়েছেন। তার কিছুদিন আগে তাঁর উপর কলকাতা মহানগরের সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কলকাতার সঙ্ঘশাখা সরকার লেনের ছাদ থেকে নেমে আসে বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের বিপ্লবী পুলিনবাবুর মাঠে, সেখান থেকে বাদুড়বাগান পার্কে এবং পরে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের একটি ঘেরা মাঠে। সেখানে এখন বিদ্যমান জিতেন্দ্র নারায়ণ রায় ইনফ্যান্ট ও নার্সারি স্কুল। এখানেই বঙ্গের প্রথম প্রাদেশিক প্রচারক শ্রীবালাসাহেব দেওরসের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম মূল শাখার ধ্বজ লাগানো এবং সঙ্ঘের প্রথম প্রার্থনা (মরাঠি ও হিন্দি) আরম্ভ হয়। অকস্মাৎ একদিন এই ঘেরা মাঠে প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে যায়। অদ্ভুত ধৈর্য সহকারে বালাসাহেব চেষ্টা করেন যাতে বন্ধ দরজা খুলে যায়। কিন্তু সফলতা এল না। শান্ত, স্থির ও দৃঢ়তার সঙ্গে বালাসাহেব কয়েকহাত জমি পরিষ্কার করে মানিকতলা তেলকলের মাঠে সঙ্ঘশাখার কাজ চালিয়ে যান। এই তেলকলের মধ্যে সঙ্ঘস্থানে শ্রীবালাসাহেব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে আমন্ত্রণ করে এনে স্বয়ংসেবকদের মাধ্যমে 'গার্ড অফ অনার' দেন। শ্রীবিঠ্ঠলরাও পাত্‌কী নাগপুর থেকে প্রথমে শ্রীগুরুজীর সঙ্গে (১৯৩৯) প্রথমে কলকাতায় আসেন কিছুদিনের জন্য এবং পরে ফিরে যান। শ্রীবালাসাহেব যখন ১৯৪০ সালে ওটিসি-র সময় নাগপুর যান তারপর দ্বিতীয় প্রাদেশিক প্রচারক শ্রীবিঠ্ঠলরাও আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং বঙ্গপ্রদেশের সঙ্ঘকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীদত্তাত্রেয় শ্রীধর গোরে (যবতমাল) কলকাতা নগরের প্রচারক ছিলেন। শ্রীবালাসাহেবজীর কলকাতা থাকাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে শ্রী আন্না কেদার এবং প্রভাকর তামসকর নামের দুজন কলেজ ছাত্র (মহারাষ্ট্রের স্বয়ংসেবক) খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাভাষা শিখে নিয়েছিলেন এবং কলকাতার সঙ্ঘশাখাতে কলেজ ছাত্রদের নিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের অবদান ছিল অপরিসীম। এসময়ে প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে ডাঃ সন্তোষ কুমার মুখার্জি এবং বাবু পদ্মরাজ জৈন ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা সঙ্ঘের প্রথম নিবাস ছিল ২৫ নং আমহার্স্ট স্ট্রিট, তিনতলায়। আমহার্স্ট স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে। সেখানেই শ্রীবালাসাহেব দেওরস অন্যান্য প্রচারকদের সঙ্গে থাকতেন। বঙ্গপ্রদেশের দ্বিতীয় প্রান্ত প্রচারক শ্রীবিঠ্ঠলরাওয়ের কার্যকাল ছিল ১৯৪০-৪৬। সেই সময় কার্যালয় উঠে আসে ২৬নং বিধান সরণি, তিনতলা। (মুখ্য শাখা) শ্যামনগর, গোয়াবাগান, দর্জিপাড়া, জানবাজার, বড়বাজার, ভবানীপুর ইত্যাদি। গঙ্গার পশ্চিমপাড় শিবপুরেও শাখা আরম্ভ হয়। কলকাতার বাইরে প্রদেশের শাখা বলতে সলপ, গাইবান্দা, ময়মনসিংহ, সুসং, নবদ্বীপ, বহরমপুর, মালদা, খড়্গপুর, শ্রীরামপুর, রানাঘাট, কাঁচড়াপাড়া, ব্যারাকপুর, বর্ধমান, সিউড়ী, শিলিগুড়ি, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ের প্রচারক ও কার্যকর্তাদের মধ্যে দত্তোপন্ত ঠেংড়ী (হাওড়া), দত্তাত্রেয় (ময়মনসিংহ), কালিদাস সালোটকর (বহরমপুর), কালিদাস বসু (নবদ্বীপ), মুরলীধর নাইক (মালদা), রামপ্রসাদ দাস, (২৪ পরগনা ও হুগলী), সুকুমার ব্যানার্জি (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাধব বনহাট্টি (বাঁকুড়া), ভাউ (বড়বাজার), নাগেশ সেজওয়ালকর (বর্ধমান) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবিঠ্ঠলরাও নাগপুরে ফিরে যাওয়ার পর তৃতীয় প্রান্ত প্রচারক হয়ে আসেন নাগপুরেরই শ্রী মনোহর রাও হরকরে। উনি বঙ্গপ্রদেশে ছিলেন ১৯৪৬-৫০। এই সময় দেশ স্বাধীন তথা দ্বিধাবিভক্ত হলো। অগণিত হিন্দু পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ থেকে বাস্তুহারা ও সর্বহারা হয়ে পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে চলে আসতে লাগলেন। গান্ধীজীর মুসলমান তোষণ নীতির প্রতিক্রিয়ায় 'একমাত্র সঙ্ঘই হিন্দুদের রক্ষা করতে পারে'— এই ধারণা মনে রেখে অনেক বর্ষীয়ান হিন্দুও কলকাতা এবং এরাজ্যের অন্যান্য জেলায় দলে দলে শাখায় যোগদান করতে লাগলেন। ঠিক এইসময় নাথুরাম গোডসে গান্ধীজীকে হত্যা করল এবং তার সমস্ত দোষ সঙ্ঘের উপর পড়ল।

ফঃ৩

ফলস্বরূপ সঙ্ঘকে অন্যায়ভাবে ১৯৪৮ সালে বেআইনি ঘোষণা করা হলো। পূজনীয় শ্রীগুরুজীকে গ্রেপ্তার করা হলো। সারা দেশে সঙ্ঘের প্রচারক ও কার্যকর্তাদের ধরপাকড়ও চলতে লাগল। এরাজ্যও বাদ গেল না। নিষেধাজ্ঞার সময়ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরস্পর মেলামেশা অব্যাহত ছিল। তবুও ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি যখন সঙ্ঘের উপর বাধানিষেধ উঠে গেল, আমরা অনুভব করলাম পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র দেশে কাজের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে গেছি। ১৯৪৮-৪৯ নিষেধাজ্ঞার সময়ে দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজী জেলের বাইরেই ছিলেন এবং এরাজ্যের কাজের দেখাশোনা করা ও যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর উপরই ছিল। হাওড়ার শিবপুরে সঙ্ঘকাজের দায়িত্ব আগে থেকেই শ্রী পাণ্ডুরঙ্গ ক্ষীরসাগরজীর উপর ছিল। হাওড়া নগরের কাজের তিনিই ছিলেন প্রধান স্থপতি। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় তিনি জেলে ভীষণ অসুস্থ হন এবং মুক্তিলাভ করার পরেই তাঁর জীবনাবসান হয়। নাগপুরে ডাক্তারজীর স্মৃতিমন্দিরের সামনেই 'পাণ্ডুরঙ্গ ভবন' তাঁর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকার্য আরম্ভের প্রথম উদ্দীপনা শ্রীগুরুজী ও শ্রীবালাসাহেবজীর কাছ থেকে এসেছিল—এটা আগেই বলা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে এই প্রদেশে সঙ্ঘের গুরুদায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা হলেন—

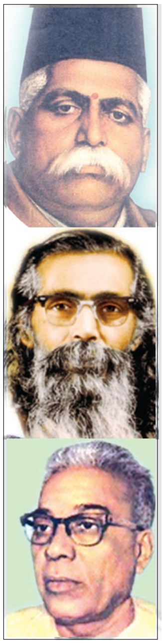

প্রান্ত সঙ্ঘচালক—অধ্যাপক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সঙ্ঘচালক (১৯৬৯-৭৯), অধ্যাপক অমল কুমার বসু ১৯৭৯-৮৪, কালিদাস বসু, অ্যাডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট। প্রথমে সহ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ১৯৮৪-৮৯ ও পরে তিনিই তৃতীয় প্রান্ত সঙ্ঘচালক।

প্রান্ত কার্যবাহ---প্রথম প্রান্ত কার্যবাহ অমল কুমার বসু ১৯৬৩-৭৭, কালিদাস বসু ১৯৭৭-৮৪, সুনীলবরণ মুখোপাধ্যায় ১৯৮৪—

প্রান্ত প্রচারক—প্রথম প্রান্ত প্রচারক ১৯৩৯-৪০ শ্রীবালাসাহেব দেওরস, বিঠ্‌ঠলরাও পাত্‌কী ১৯৪০-৪৬, মনোহর হরকরে ১৯৪৬-৫০ (নিষেধাজ্ঞা-সহ)। অমল কুমার বসু ১৯৪৯ সালে প্রথম কয়েক মাস দক্ষিণ কলকাতার প্রচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন পরে প্রান্ত প্রচারক ১৯৫০-৭৭), অমলকুমার বসু (২য় বার) পরে প্রান্ত প্রচারক হলেন ১৯৭৭-৭৯। শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত সহপ্রান্ত প্রচারক ১৯৭৭-৭৯, প্রান্ত প্রচারক ১৯৭৯-৯১, শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ সহপ্রান্ত প্রচারক ও প্রান্ত প্রচারক ১৯৮১-'৯১, সুনীলপদ গোস্বামী ১৯৯১ প্রান্ত প্রচারক।

পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক—একনাথ রাণাডে ১৯৪৯-৫৩, পরে অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ, সরকার্যবাহ, ১৯৬২ বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল। **ভাউরাও দেওরস** পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রচারক- ১৯৬৫-৭৫, **রজ্জু ভাইয়া** ১৯৭৫-৭৭, **কেএস সুদর্শন** ১৯৭৭-৮১। **বাবুরাও পালধিকর** ১৯৮২...। কিছুদিন **শ্রীমধুসূদন দেও** ছিলেন। পরে **শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ** ১৯৯১...। সঙ্ঘের উপর দ্বিতীয় আঘাত আসে ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সঙ্ঘকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ সেদিন দেশব্যাপী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সত্যাগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ছিল তার পুরোভাগে। প্রবল জনমতের চাপে, সেবারের লোকসভার নির্বাচনে সেই প্রথম কংগ্রেস দল কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সঙ্ঘ দ্বিতীয়বার সরকারি বাধা ও বিরোধের কষ্টিপাথরে সঙ্ঘশক্তিকে যাচাই করে এবং সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। এরপর আরও ১৫টি বছর পার হয়ে গেছে। সংগঠনের স্বাভাবিক নিয়েমে এবং প্রচারক, কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের নিরলস প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের শাখার সংখ্যা এখন প্রায় ১০০০। গত কয়েকবছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘ কাজের অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি সীমান্তবর্তী জেলাগুলি ছাড়াও বর্ধমান, বীরভূম জেলাতেও শাখার সংখ্যা ১২৫ থেকে ১৫০ মধ্যে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সারা প্রদেশে একটি মাত্র সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের আয়োজন করতে হতো। এখন প্রথম বর্ষের জন্য উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আলাদা আয়োজন করতে হয়। এছাড়া দ্বিতীয় বর্ষের বর্গতো আছেই। প্রদেশে প্রচারকের সংখ্যাও বাড়ছে।

পরম পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সম্প্রতি একশো জনের বেশি স্বয়ংসেবক প্রচারক রূপে সঙ্ঘের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রচারকের সংখ্যা ২২৫। সম্প্রতি সুনীলপদ গোস্বামী নবীন প্রাদেশিক প্রচারক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে। প্রাদেশিক কার্যকরী মণ্ডলের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৪। 'সঙ্ঘ সমাচার' ও 'জাগরণ' নামে দুটি পত্রিকা সঙ্ঘের প্রকাশন বিভাগ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পরিশ্রমে ও অর্থে ১৯৮৯ সালে সঙ্ঘের নতুন প্রাদেশিক কার্যালয় 'কেশব ভবন'-এর উদ্বোধন হয়েছে। এই উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের কাজের বিস্তারের জন্য অন্য প্রদেশ থেকে যাঁরা প্রচারক এসেছিলেন তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর জন্মশতাব্দীর কার্যক্রম উপলক্ষ্যে সারা প্রদেশে প্রায় ১০,০০০ গ্রামে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ইতিমধ্যেই বহু গ্রামে 'সঙ্ঘমণ্ডলী' গঠিত হয়। তাছাড়া সঙ্ঘের প্রচার অভিযান, ষাট বছর পূর্তি প্রভৃতি কার্যক্রম স্বয়ংসেবকরা উৎসাহের সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। একাত্মতা যজ্ঞযাত্রা, রামশিলা পূজা, করসেবা প্রভৃতি হিন্দু জাগরণের নানা কাজে স্বয়ংসেবকরা প্রথম সারিতে থেকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে সাহায্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের ইতিহাসে এই প্রথম প্রান্ত প্রচারক তথা তদূর্ধ্বদের বার্ষিক দীপাবলী বৈঠক (১৯৯১) কলকাতায় হলো। বৈঠক উপলক্ষ্যে স্বয়ংসেবকদের একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এরকম সম্মেলন এর আগে কখনও এরাজ্যে হয়নি। কল্যাণী শিবিরও এরাজ্যের স্বয়ংসেবকদের (২৩-২৬ জানু. ৯২) কাছে একটি ঐতিহাসিক কার্যক্রম। এর আগে ব্যাঙ্গালোর ও পুণায় এইরকম বিশাল শিবির হয়েছিল। এরাজ্যের সত্তরের দশকে এইরকম বিশাল শিবিরের প্রচেষ্টা একবার হয়েছিল। কিন্তু একাত্তরের যুদ্ধের জন্য তা স্থগিত রাখতে হয়। ১৯৯২-এর এই প্রাদেশিক শীত শিবির পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের কাছে এক প্রেরণাদায়ী স্মৃতি হয়ে থাকবে।

(লেখক প্রয়াত প্রান্ত কার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ)

বঙ্গের সঙ্ঘকাজে স্বয়ংসেবকদের বলিদান ও আত্মত্যাগের ইতিহাস

আনন্দ মোহন দাস

বঙ্গপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্য বিস্তারের লক্ষ্যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তারা যেভাবে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে পরিশ্রম ও আত্মাহুতি দিয়েছেন তা সঙ্ঘ শতবর্ষে অবশ্যই স্মরণীয়। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কমিউনিস্টদের দ্বারা সঙ্ঘকাজে বাধাদান, নির্মম অত্যাচার, হত্যা, হুমকি ও সংঘর্ষকে উপেক্ষা করে নিজের জীবনকে বাজি রেখে স্বয়ংসেবকরা যে অবদান রেখে গেছেন, শতাব্দীবর্ষে তাঁদের স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। তাই শতবর্ষের যাত্রাপথে দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত এই সমস্ত হুতাত্মা স্বয়ংসেবকদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ এবং ১০০ বছরে সঙ্ঘের যাত্রাপথকে সফল করতে যাদের অবদান রয়েছে, তাদের কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা একান্ত আবশ্যক।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় মানিকতলা সঙ্ঘস্থানে ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী এবং সঙ্ঘের অন্যান্য অধিকারীদের উপস্থিতিতে বঙ্গপ্রদেশে প্রথম সঙ্ঘ শাখা শুরু হয়।

প্রথমদিকে সঙ্ঘের সাংগঠনিক শক্তি কম থাকায় স্বাধীনতার আগে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের কাজে রাজনৈতিক বিরোধিতা খুব একটা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর হত্যার পর কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা পঞ্চাশের দশকে সঙ্ঘের উপর মিথ্যা অভিযোগপ্রসূত তীব্র আক্রমণ চালিয়ে গেছে। সেই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে শত বাধা উপেক্ষা করে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা নাগরিকদের বৈঠকে সকলকে সঙ্ঘের আদর্শ ও কার্যপদ্ধতির বিষয়ে অবহিত করে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরেছেন।

স্বাধীনতার আগে থেকেই কমিউনিস্টরা আদর্শগত বিরোধ থাকায় সঙ্ঘের কাজে সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করতো। সঙ্ঘকে গান্ধী হত্যাকারী দাগিয়ে দিয়ে কমিউনিস্টরা এ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘকাজের বিস্তার রুখে দেওয়ার জন্য হিংসার আশ্রয় নিতে পিছপা হয়নি। এমনকী কমিউনিস্টরা শাখা বন্ধ করতে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের হত্যাও করেছে। কারণ তাঁরা মনে করতো সঙ্ঘের সংগঠন বৃদ্ধি পেলে সাংগঠনিক শক্তি হিসেবে সঙ্ঘ তাদের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজে বাধা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপর হিংসাশ্রয়ী হামলা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদীরা তাদের শাসনকালে প্রায় ৫০ জনের বেশি স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে অশোক মোদক ও অতুল ভাটখালকারের নেতৃত্বে মুম্বাইয়ের Centre for Leadership Studies-এর রিপোর্টেও এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত স্বয়ংসেবক হুতাত্মা হয়েছেন, তাদের কয়েকজনের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় খান সেনাদের হাতে থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে বালুরঘাটের কাছে চকরাম প্রসাদ গ্রামের স্বয়ংসেবক ওই শাখার মুখ্য শিক্ষক চুরকা মুর্মুর আত্মবলিদানের ইতিহাস ভোলার নয়। যুদ্ধের সময় বিশাল পাকিস্তানি সেনা চকরাম গ্রামটি ঘিরে ফেলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভারতীয় সেনাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এদিকে চুরকা মুর্মু ভারতীয় শিবিরের বাক্স ভর্তি গোলা বারুদ পাকিস্তানি সেনাদের হস্তগত হওয়া থেকে বাঁচাতে ও নিষ্ক্রিয় করতে নিকটবর্তী পুকুরে ফেলতে গেলে খান সেনাদের নজরে পড়ে যায়। তারা চুরকা মুর্মুকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। ঘটনাস্থলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক চুরকা মুর্মু বীরগতিপ্রাপ্ত হয়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্টরা স্বয়ংসেবকদের ওপর অসহনীয় অত্যাচার শুরু করে। শত বিরোধিতা ও উসকানিমূলক প্ররোচনা সত্ত্বেও স্বয়ংসেবকদের মনোবল তারা ভাঙতে পারিনি। হিলি থানার মুরারীপুর শাখা আরএসপি ও সিপিএমের গুন্ডা বাহিনী বন্ধ করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৮৪ সালের ১৫ মার্চ আরএসপি ও সিপিএমের হার্মাদবাহিনী সরাসরি শাখার উপর হামলা করলে স্বয়ংসেবকদের অনেকেই ভীষণভাবে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। অনেক চেষ্টা করেও নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর দাদা সুকেশচন্দ্র মণ্ডল দীর্ঘ চিকিৎসার পরেও আজ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হননি। বর্তমানে তিনি সঙ্ঘের একজন প্রবীণ প্রচারক।

১৯৮৩ সালে মুর্শিদাবাদের বামনাবাদে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময় সিপিএম মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা বাধা দিতে এসে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক জগদীশ সাহাকে খুন করে। ১৯৮৯ সালে এই জেলারই স্বয়ংসেবক জয়ন্ত পালকে রামশিলা পূজনকে কেন্দ্র করে বাম ও মোল্লাবাদীদের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা হত্যা করে। ১৯৯২ সালের ২৫ জুন, ভারত সরকার বাংলাদেশকে 'তিনবিঘা' ছিটমহল হস্তান্তরের দিন ধার্য করে। এর বিরুদ্ধে এবিভিপি, বিজেপি-র সদস্য ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নামে। বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে জিতেন রায়-সহ তিনজন কার্যকর্তাকে হত্যা করে এবং বহু সত্যাগ্রহী আহত হন। এই বামপন্থী উগ্রবাদীদের বিরুদ্ধে স্বয়ংসেবকরা বুক চিতিয়ে লড়াই করেছেন। তিনবিঘা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সঙ্ঘের তদানীন্তন প্রচারক মনোমোহন রায়।

হুগলি জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার জগন্নাথপুর গ্রামের প্রায় সকলেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। এখানে সংগঠনের শক্তি দেখে সঙ্ঘ বিরোধী সিপিএম

ওই গ্রামে শাখা বন্ধ করতে ক্ষেতমজুর বন্ধ-সহ কার্যকর্তাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করতে শুরু করে। অবশেষে সিপিএম শাখা বন্ধ করতে না পেরে, ২০০১ সালের ১৩ এপ্রিল সকালে নিজের বাড়ির উঠানে ওই শাখার প্রমুখ কার্যকর্তা ও তদানীন্তন জেলা শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ দয়াল সিংহরায় এবং তার দাদা হর্ষবর্ধন সিংহরায়কে স্ত্রী, পুত্র ও মায়ের সামনে সিপিএম গুন্ডারা শাবল, কুড়ুল ও অস্ত্র নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এমনকী সিপিএম তাদের গ্রামে মৃতদেহ সৎকার করতে দেয়নি। সেজন্য তাদের মামার বাড়ির গ্রামে মৃতদেহ সৎকার করতে হয়। দয়াল ছিলেন সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই ওই অঞ্চলে সঙ্ঘের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হুগলি জেলার ধনেখালি অঞ্চলের গুড়াপে ১৯৯৩ সালে সঙ্ঘের শাখা আরম্ভ হয়। বামফ্রন্টের আমলে ধনেখালি অঞ্চল সিপিএমের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ছিল। তাই এই শাখা সিপিএম পার্টির কুনজরে পড়ে এবং সঙ্ঘের শাখা বন্ধ করতে স্বয়ংসেবকদের ওপর তারা বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। সিপিএম পার্টি সঙ্ঘের প্রভাব সহ্য করতে না পেরে, সঙ্ঘকাজের বৃদ্ধির কারিগর কঙ্কা টুডু নামে এক প্রমুখ জনজাতি স্বয়ংসেবককে রাতের অন্ধকারে হত্যা করে রেললাইনে ফেলে দেয়। কিন্তু সিপিএম শত চেষ্টা করেও এই অঞ্চলে সঙ্ঘের কাজ বন্ধ করতে পারেনি।

মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ডে প্রায় ২০টি প্রভাবী শাখা রয়েছে। ১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘের কাজের প্রভাব দেখে সঙ্ঘের সংগঠনকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিভিন্নরকম বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করে। কখনো শাখার মাঠ দখল, স্বয়ংসেবকদের হুমকি, পুলিশ কেস ইত্যাদি ছিল সিপিএমের নিত্যনতুন কৌশল। ১৯৮৪ সালে শাখার মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে নিবড়া শাখার কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সিপিএম গুন্ডা বাহিনীর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। অনেকে আহত হন এবং কার্যকর্তা স্বয়ংসেবকদের বিরুদ্ধে শাসকদলের মদতে মিথ্যা এফআইআর করা হয় এবং জমিতে ধান কেটে নেওয়া চাষবাস, মজুর বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও স্বয়ংসেবকদের কাছে ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দাবি করা হয়।

এই সংঘর্ষে শাসক সিপিএম দলের প্রায় ২০০ জন গুন্ডা লাঠি, টাঙ্গি, বল্লম ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেবাংশু পতি নামে এক কার্যকর্তার উপর নৃশংসভাবে হামলা করে। এর ফলে দেবাংশু পতির মাথা ও কান-সহ মুখে আঘাত তীব্রতর হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজও দেবাংশুর মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে যা সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের স্মৃতি বহন করছে।

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোডের একটি স্কুলে শীতকালীন শিবির ও পথ সঞ্চলন দেখে বামপন্থীরা জেলায় সঙ্ঘের সংগঠন মজবুত হয়েছে বলে অনুভব করে। সেজন্য লাল সন্ত্রাসবাহিনীর কাছে নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক বাবলু কারক চিহ্নিত হয়ে যায়। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে রাতের অন্ধকারে সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী তাকে অপহরণ করে চরম অত্যাচার করে। তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৩ সালের ২৬ জুন মেদিনীপুরের গড়বেতায় স্বয়ংসেবক শীতল মণ্ডলের ওপর সিপিএম নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শীতল আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় এবং মৃত্যুকালীন জবানবন্দি লিখে যায়।

২০০০ সালের ২৫ জুন মেদিনীপুর জেলার বোরামুণ্ডা গ্রামে সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী মোটরবাইকে চেপে গ্রামে ঢুকে সক্রিয় স্বয়ংসেবক ও কৃষক সুকুমার রুইদাসের ওপর হামলা করে এবং বুকে গুলি করে হত্যা করে।

এই জেলারই কোরাগিয়া গ্রামে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী সন্ধ্যার সময় গ্রামে সশস্ত্র আক্রমণ করে। গ্রামের সক্রিয় স্বয়ংসেবক ও চাষি অভিজিৎ সরকার এবং তার ভাইয়েরা গ্রামবাসীদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সিপিএম ক্যাডার বাহিনীকে গ্রামছাড়া করা পর্যন্ত লড়াই জারি থাকে। এই সংঘর্ষের ফলে গুন্ডা বাহিনীর হাতে অভিজিৎ আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন জেলার তিন নম্বর সোনাখালি অঞ্চলে বামপন্থী আরএসপি দলের জেহাদি মুসলমানরা স্থানীয় হিন্দুদের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নিপীড়ন ও অত্যাচার চালাচ্ছিল। মা, বোনেদের সম্ভ্রমহানি, মাঠের ধান বা পুকুরের মাছ কোনোটাই শাসক দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পেত না। কিন্তু সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এখানে রুখে দাঁড়ায় এবং এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে। ২০০২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আরএসপির মুসলমান দুষ্কৃতী শেখ আনোয়ার ও তার দলবল সন্ধ্যায় তরতাজা চারজন স্বয়ংসেবককে তুলে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সঙ্ঘের কাজ বন্ধ করতে কার্যবাহ, শারীরিক প্রমুখ-সহ চারজন সক্রিয় স্বয়ংসেবককে বাম-জেহাদি হিংসার বলি হতে হয়।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জের প্রমুখ স্বয়ংসেবক এবং গোপালগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সুপরিচিত সাহিত্যিক কমলেশ সরকার বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। সেই সময় সিপিএম দলের প্রবল চাপে স্কুল কমিটি কমলেশ সরকারকে অন্যায়ভাবে শিক্ষকতার চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়। এর বিরুদ্ধে তিনি আদালতে মামলায় জয়লাভ করে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাঁর এক সহকর্মী সিপিএমের কার্ড হোল্ডার তাঁকে ছুরিকাঘাত করে। ২২ দিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর কমলেশ সরকার ১৯৯৪ সালে ৩১ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রায়গঞ্জের স্বয়ংসেবক প্রিয়নাথ দেবশর্মার ভাই বিশ্বনাথ দেবশর্মাকে সঙ্ঘকাজ করার অপরাধে ১৯৮৯ সালে বাড়ি ফেরার পথে সিপিএমের জেহাদি গুন্ডারা অতর্কিতে আক্রমণ করে রাস্তায় কুপিয়ে হত্যা করে।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের সংকল্প নিয়ে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সারা দেশে রামশিলাপূজন, রথযাত্রা, একাত্মতা যাত্রা, শ্রীরামজ্যোতি যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক স্তরে প্রবল হেনস্থা এবং সিপিএম দলের রাজনৈতিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। যদিও দিকে দিকে সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রামমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্য স্বয়ংসেবকরা কয়েক হাজার রামশিলা অযোধ্যায় পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণকল্পে করসেবায় শামিল হয়ে কলকাতা বড়বাজারের স্বয়ংসেবক ভ্রাতৃদ্বয় রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী মুলায়ম সিংহ যাদবের পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৯০ সালে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় সঙ্ঘকাজের বিস্তারের জন্য সঙ্ঘের যোজনায় শ্যামল সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত, দীনেন দে ও শুভঙ্কর চক্রবর্তীর মতো চারজন বঙ্গের বরিষ্ঠ কার্যকর্তাকে ত্রিপুরায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টান জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটি এঁদের সকলকে অপরহণ করে হত্যা করে। এঁরা সকলেই আমাদের কাছে আজও অমর হয়ে রয়েছেন।□

সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ ডাকটিকিট এবং স্মারক মুদ্রা প্রকাশ

গত ১ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা ডাকটিকিট এবং ১০০ টাকার স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় এই মুদ্রা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

এই সংগঠনটি সমগ্র ভারত জুড়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগে ত্রাণ এবং সমাজসেবায় গত এক শতাব্দী ধরে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক ডাকটিকিট ও মুদ্রা এই অবদানের প্রতীক। সঙ্ঘের প্রশংসা করে এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'আজ ভারত সরকার সঙ্ঘের ১০০ বছরের গৌরবময় যাত্রা স্মরণে বিশেষ ডাকটিকিট এবং স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেছে। ১০০ টাকার মুদ্রার একদিকে জাতীয় প্রতীক এবং অন্যদিকে সিংহের মূর্তি-সহ ভারতমাতার একটি মূর্তি রয়েছে। সঙ্ঘের ১০০ বছরের গৌরবময় যাত্রা হলো ত্যাগ, নিঃস্বার্থ সেবা, দেশ গঠন এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতার এক অসাধারণ উদাহরণ।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের স্বয়ংসেবক প্রজন্মের সঙ্ঘের শততম বর্ষ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ব্যক্তিনির্মাণের মাধ্যমে রাষ্ট্রনির্মাণে উপর জোর দিয়েছে। ফলে জাতিগত ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সমাজ।' সম্ভবত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ভারতীয় মুদ্রায় ভারতমাতার ছবি এই ধরনের প্রথম উদাহরণ। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কয়েন বা মুদ্রাটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নীতিবাক্য/ধ্যেয়বাক্য সংবলিত : 'রাষ্ট্রায় স্বাহা, ইদম্ রাষ্ট্রায়, ইদম্ ন মম।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৬৩ সালে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা, যাঁরা দেশের সেবা এবং সমাজের ক্ষমতায়নে নিরন্তর নিয়োজিত, তাঁদের প্রতিফলনও এই ডাকটিকিটটিতে দেখা যাচ্ছে। এই স্মারক মুদ্রা এবং ডাকটিকিটগুলির জন্য আমি দেশবাসীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের প্রজন্মের স্বয়ংসেবকদের সৌভাগ্য যে, আমরা সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মতো একটি মহান অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে চলেছি। আজ এই উপলক্ষ্যে আমি জাতির সেবায় নিবেদিত কোটি কোটি স্বয়ংসেবকদের আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। আমি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, আমাদের সকলের আদর্শ, পরম শ্রদ্ধেয়, প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ হেডগেওয়ারজীর শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।'

শতবর্ষের সূচনায় মহালয়াতে তিন বঙ্গের কার্যক্রম

উত্তরবঙ্গ (মোট কার্যক্রম ১১৬ স্থানে)

পথসঞ্চলন ১০৭ স্থানে। স্বয়ংসেবক উপস্থিতি - ১০,৫৭৬
নাগরিক উপস্থিতি - ৩৫৩৪ পুরুষ, ১৯০৭ মাতৃশক্তি
মোট উপস্থিতি - ১৬,০১৭

মধ্যবঙ্গ (মোট কার্যক্রম ২২৪ স্থানে)

পথসঞ্চলন ২২ স্থানে। স্বয়ংসেবক উপস্থিতি - ১১৭৯৮
নাগরিক উপস্থিতি - ১৩৮৬২ পুরুষ, ৫১৮০ মাতৃশক্তি
মোট উপস্থিতি - ৩০,৮৪০

দক্ষিণবঙ্গ (মোট কার্যক্রম ৩০৩ স্থানে)

পথসঞ্চলন ৪৪ স্থানে। স্বয়ংসেবক উপস্থিতি - ১৫৯৩৩
নাগরিক উপস্থিতি - ৪৫৭৫ পুরুষ, ২৫১৭ মাতৃশক্তি
মোট উপস্থিতি - ২৩,০৩৫

দক্ষিণবঙ্গ

উত্তরবঙ্গ

মধ্যবঙ্গ

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপন

বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত একনাথ রানাডে বিভাগের উদ্যোগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর উত্তর কলকাতার স্বামীজীর পৈতৃক আবাস সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ মঞ্চে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপিত হলো। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ প্রান্ত প্রমুখ শ্রীমতী মালবিকা চট্টোপাধ্যায় এবং একনাথ বিভাগের সঞ্চালক দেবাশিষ লাহিড়ী। মুখ্য অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অভিনেতা তথা নাট্যকার ড. জনার্দন ঘোষ। মঙ্গলাচরণ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। অতিথি বরণ ও স্বাগত

ভাষণের পর নবমশ্রেণীর ছাত্রী অদ্রিজা রায়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বামীর স্বদেশমন্ত্র। এরপর 'বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক ভাষণ দেন শ্রীমতী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমতী মধুমিতা ভট্টাচার্যের সংগীত পরিবেশনের পর "Role of youth in building Bharat in light of Swami Vivekananda's action plan"(স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম পরিকল্পনার আলোকে ভারত গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা) বিষয়ে ভাষণ রাখেন ড. জনার্দন ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠন সম্পাদক বিশ্বাস সরোলকর এবং কলকাতার সংগঠন সম্পাদিকা ড. কথাকলি ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে ছিল পুরস্কার বিতরণী। কয়েকদিন আগে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্রের ওপর যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল মোট ১৮টি স্কুল এবং ১টি কলেজের ২৫০জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এদিন বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনলাইনে আরেকটি প্রতিযোগিতার বিজয়ীদেরও এদিন পুরস্কার প্রদান করা হয়। দেবাশিষ লাহিড়ীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শান্তিমন্ত্রোচ্চারণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১৩২তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১১ সেপ্টেম্বর বেহালা

পর্ণশ্রী বিবেকানন্দ কাননে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দেরর প্রতিকৃতিতে মাল্যর্পণ, পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সদস্য সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পাঠচক্রের সদস্য কুমারী প্রিয়া রায় স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতা পাঠ করেন। পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় এদিনটির তাৎপর্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। এরপর সদস্যরা একে একে তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধলেন স্বামী বিবেকানন্দের গভীর জীবনবোধ এবং তাঁর অনন্য দেশপ্রেমের নানান দৃষ্টান্ত। পরিশেষে পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন ঘোষের ধন্যবাদমূলক ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

স্বস্তিকা পূজাসংখ্যা (১৪৩২) প্রকাশ

গত ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আউট্রাম ঘাট জেটি লাউঞ্জের 'দ্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট অথরিটি অফিসার্স ক্লাব'-এ আয়োজিত হয় জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা-র পূজাসংখ্যা, ১৪৩২' প্রকাশ অনুষ্ঠান। দীপ প্রজ্বলন মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি এবং বিশিষ্টজনেরা ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং স্বস্তিকার অন্যতম নির্দেশক সৌরভ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী শ্রী সজ্জন ভজঙ্কা। অনুষ্ঠানে 'প্রধান অতিথি' ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো। বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। অনুষ্ঠানের সভাপতি সৌরভ ঘোষ উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেন। উচ্চারিত হয় পবিত্র বেদমন্ত্র। এরপর সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে উদ্বোধনী সংগীত 'বাজলো তোমার আলোর বেণু' পরিবেশন করেন সোমা চক্রবর্তী। স্বাগত ভাষণ দান করেন স্বস্তিকার প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল। তাঁর বক্তব্যের পর সম্মাননীয় অতিথিদের করকমলে হয় '১৪৩২ বঙ্গাব্দের স্বস্তিকা পূজাসংখ্যা' এবং 'হিন্দি স্বস্তিকা-র ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সংখ্যা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। এরপর বক্তব্য রাখেন জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো। স্বস্তিকা পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি। সকলের আগ্রহ, উৎসাহ ও প্রয়াসের কারণে স্বস্তিকার প্রচার-প্রসারের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে বলেও তিনি জানান। এরপর পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পপতি শ্রী সজ্জন ভজঙ্কাকে স্বস্তিকার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁকে সম্মানিত করেন স্বস্তিকার অন্যতম নির্দেশক অরিন্দম সিংহরায়। তাঁকে অর্পিত মানপত্রটি পাঠ করে শোনান মাসিক হিন্দি স্বস্তিকা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে। এরপর সোমা চক্রবর্তীর কণ্ঠে পরিবেশিত হয় রিয়া বিশ্বাস রচিত এবং ভরত কুণ্ডুর সুরারোপিত 'ওগো মা দুর্গা জাগো মা দুর্গা' গানটি। এরপর বক্তব্য রাখেন এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা এবং বিশেষ অতিথি অদ্বৈতচরণ দত্ত। ভারতীয় ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কার, পরম্পরার বিষয় আলোচনার সঙ্গে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ১৯৪৮ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত স্বস্তিকার অবিরাম পথ চলার বৃত্তান্ত। আগামীদিনগুলিতে সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে স্বস্তিকার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে

অনুষ্ঠান এবং লেখক সম্মেলন

বলেও তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্যের পর অনুষ্ঠানের সভাপতি সৌরভ ঘোষ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি অজিত জানা। ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর 'পূজাসংখ্যা, ১৪৩২' প্রকাশ উপলক্ষ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে আয়োজিত হয় লেখক সম্মেলন। প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত রায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দ, স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য-সহ এষা দে, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয়ভূষণ দাশ, ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, ড. তরুণ মজুমদার, ড. গোপাল চক্রবর্তী, ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্য, ড. রাকেশ দাশ, ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি, নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, সুতপা বসাক ভড়, মৌ চোধুরী, মানস চৌধুরী, প্রণব দত্ত মজুমদার, সুদীপ্ত গুহ, প্রবীর ভট্টাচার্য্য, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য, সরোজ চক্রবর্তী, দেবদাস কুণ্ডু, সিদ্ধার্থ সিংহ, অজয় ভট্টাচার্য, অর্ণব কুমার দে প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক-লেখিকারা এদিন এই সম্মেলনে যোগ দেন। পরিচয়পর্বের পর সকলের সম্মিলিত আলাপচারিতায় এদিনের লেখক সম্মেলনটি একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভায় পরিণত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। স্বস্তিকার লেখক-লেখিকাদের হাতে সদ্যপ্রকাশিত পূজাসংখ্যা তুলে দেন স্বস্তিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা, যুক্তাক্ষর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মেনে বাংলা বানান লেখা-সহ জাতীয়তাবাদী সাহিত্য রচনার বিষয়ে সকলেই সহমত হন। সাহিত্য রচনার মাধ্যমে সমাজকে একটি নির্দিষ্ট বার্তা প্রেরণ এবং রাষ্ট্রবাদী বিমর্শকে ভিত্তি করে নিবন্ধ ও প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে সকলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শান্তি মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে এদিন সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফঃ ৪

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিধাননগর-স্থিত পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত হয় 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ'-শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় এবং 'বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ' ও 'শ্যামাপ্রসাদ অনুশীলন কেন্দ্র'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল 'কবির গানে রামনাম' এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য।

অভিভাবকদের ইচ্ছায় আইন পড়তে ইউরোপ গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সুর ও ছন্দে বিমোহিত হয়ে দেশে ফিরে এসে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে দু'টি রামায়ণ-আধারিত কাব্যনাট্য রচনা করেন--- 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'। গৌড়ীয় নৃত্যের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ড. সৌম্য ভৌমিকের পরিচালনায় 'কালমৃগয়া' নৃত্য নাটকটির এদিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সকল দর্শক ও বিশিষ্টজন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়ার্ধের বিষয় ছিল— 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন বাঙ্গলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের রসায়ন বাঙ্গালির ভাষা- সংস্কৃতির আন্দোলনের এক নতুন পর্বের সূচনা করে। বিশ্বকবির নোবেল পুরস্কার লাভের আগেই কবিকে 'সাম্মানিক ডি লিট' প্রদান করে স্যার আশুতোষ কবির প্রতিভাকে জাতীয় স্বীকৃতিদান করেন।

সম্পর্কের এই রসায়ন আরও ঘনীভূত হয় ড. শ্যামাপ্রসাদের সময়কালে। মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থায় বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য ১৯৩৪ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাজশেখর বসু, প্রমথনাথ চৌধুরী-সহ ১২ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেন সেই সময়ে সদ্য নিয়োজিত, ৩৩ বছর বয়সি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলাভাষার আন্দোলনের কথা বললে এটিই বাঙ্গালির ইতিহাসে প্রথম ভাষা আন্দোলন। ইতিহাসের এই অধ্যায়টি-সহ আরও অনেকগুলি বিষয় সহজ কথায় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে, চমৎকারভাবে তুলে ধরেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সুবক্তা ড. রাকেশ দাশ।

এর আগে বক্তব্য রাখার সময়ে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ও বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রী আশিস গিরি বলেন যে, ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি হলো সংস্কৃত-নির্ভর এবং বাংলাভাষার উৎসও সংস্কৃত ভাষা। সেই সংস্কৃতকে বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে রেখে দেওয়া হলো বিগত বামফ্রন্ট সরকার এবং বর্তমান সরকারের একটি কৌশল। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে রাজ্যের শাসকদলগুলি ভাষা আন্দোলনের নামে যে ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে তার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, আপামর বাঙ্গালির জন্য এটি অত্যন্ত লজ্জাজনক। সুকৌশলে, সচতুরভাবে বাঙ্গালির মুখের ভাষা কীভাবে আরবীয় সংস্কৃতির হাতে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হচ্ছে— নানা উদাহরণ দিয়ে তা তুলে ধরে শুরুতেই এদিনের আলোচনাসভার সুরটিকে বেঁধে দেন সঞ্চালক প্রবীর ভট্টাচার্য। ড. শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে একটি স্বরচিত ও আবেগঘন কবিতা পাঠ করেন বিশিষ্ট অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী অজয় নন্দী, শল্যচিকিৎসক ডাঃ মধুসূদন পাল, অধ্যাপক শ্রী বিমলশঙ্কর নন্দ, বিশিষ্ট প্রকৌশলী ও অর্থনীতিবিদ শ্রী সুদীপ্ত গুহ, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী দেবজিৎ সরকার, সংস্কার ভারতীর পূর্বাঞ্চল প্রমুখ শ্রী অধীর রায় ও উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক শ্রী উদয় দাস এবং বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রী রুদ্রনীল ঘোষ।

Today's Choice.....
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে মাদপুরে মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকারের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ১৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে এক মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য কল্যাণ কুমার মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি অনিমেশ পাহাড়ি, প্রান্তের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা গোপেন বেরা এবং নারী সশক্তীকরণের পক্ষে নমিতা নায়েক। সম্মেলনের শুরুতে ভারতমাতা, ভগবান বলরাম এবং দত্তোপন্ত ঠেংড়ীজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন উপস্থিত অতিথিগণ। উপস্থিত বক্তাগণ মালোয়া রাজ্যের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকরের কর্মমুখী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি অনিমেশ পাহাড়ি বলেন, মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকর নারীজাতির আদর্শ ছিলেন। বঙ্গপ্রদেশের লোকমাতা রানি রাসমণি এবং রানি ভবানীর মতো তিনিও সমাজে প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধে সমাজ সমস্কার করেছেন। মাতৃজাতিকে আত্মনির্ভর করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী নমিতা নায়েক মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজের কথা বলেন।

জলমগ্ন কলকাতার গরিব মানুষের পাশে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির

গত ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে কলকাতার কাঁকুড়গাছি শ্রীকৃষ্ণ কলোনি এবং মানিকতলার খালধার ডোমপাড়াতে জলমগ্ন দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে সেবাকাজ পরিচালনা করে দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির। এদিন খিচুড়ি রান্না করে প্রভু জগদ্বন্ধুকে নিবেদন করার পর সেই প্রসাদ জলমগ্ন গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহাউদ্ধারণ মঠের সম্পাদক শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী এবং ইন্টারন্যাশনাল বেদান্ত সোসাইটির স্বামী অচ্যুতানন্দজী মহারাজ। দেশের মাটি কল্যাণ মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত মজুমদার, সম্পাদক মিলন খামারিয়া, ট্রাস্টি সুমন রায় এবং সদস্য বিধান সরকার এই সেবাকাজে অংশগ্রহণ করেন।এদিন ৮০০ জন জলমগ্ন গরিব

মানুষের হাতে দুপুরের খাবার তুলে দেওয়া হয়। মাহারাজরাও নিজ হাতে গরিব মানুষদের হাতে প্রসাদ তুলে দেন।

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.

PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

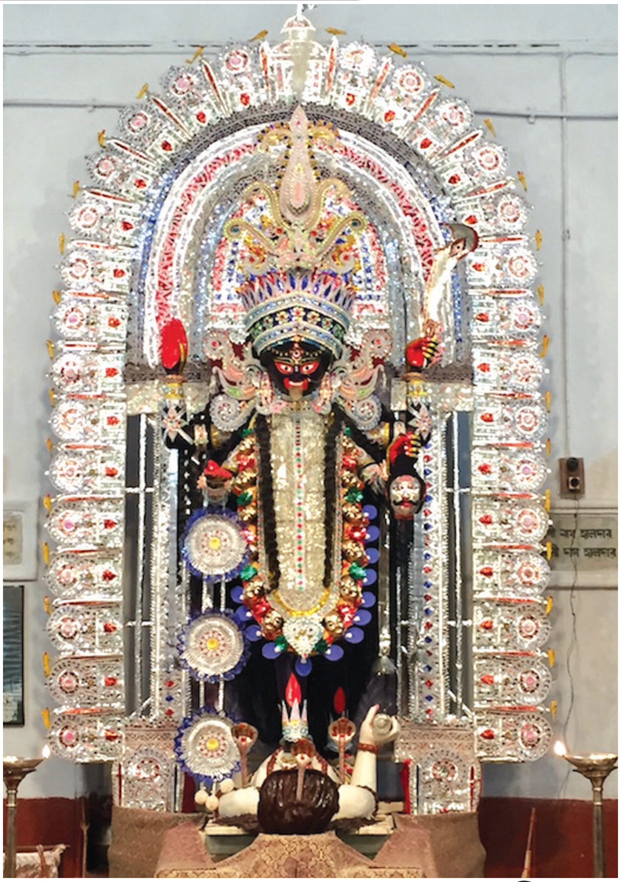

বউবাজার হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় কালীপূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

কলকাতা শহরে বেশ কিছু বনেদি পরিবার আছে, যারা নিষ্ঠা, ঐতিহ্য ও পরম্পরা বজায় রেখে প্রতি বছর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় নিজ গৃহে শক্তি আরাধনায় ব্রতী হন। মধ্য কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে ১৫ নম্বর রমানাথ কবিরাজ লেনের হালদার বাড়িতে কালীপূজার সূচনা হয় ইংরেজি ১৭৫০ সালে। সূত্রপাত করেন আদিপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ হালদার। এবার এই পূজা ২৭৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। শুরু থেকে একই ঠাকুরদালানে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হালদার পরিবারের আদি নিবাস ছিল হুগলি ও বর্ধমান জেলার মধ্যবর্তী বাদলা গ্রামে। সতেরোশো শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় আসেন লক্ষ্মীনারায়ণ হালদার। বাদলা গ্রামে ছিল তাদের জমিদারি। হালদাররা ছিলেন ব্যবসায়ী পরিবার। বাড়ির কেউ পরের গোলামি করতে পারবে না, এই ছিল পরিবারের রীতি। কলকাতাতেও বউবাজার, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ প্রভৃতি অঞ্চলে হালদারদের প্রচুর জমিজমা ছিল। চা বাগান, হার্ডওয়ারের ব্যবসা, জাহাজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ছিল হালদার পরিবারের মূল ব্যবসা। লক্ষ্মীনারায়ণের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ রাখালদাস হালদারের সময় ব্যবসা আরও প্রসারিত হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যবসা- বাণিজ্যের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হালদাররা প্রথম সারিতে ছিলেন। সেই সময় কলকাতার অভিজাত ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব এবং টালিগঞ্জ ক্লাব-এর সদস্য ছিলেন রাখালদাস হালদার। ক্যালকাটা ক্লাবের প্রথম দশজন ভারতীয় সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাখালদাসবাবু। ১৯৪৩ সালে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন সংযোগ দেওয়া হয় যে পঞ্চাশটি, তার মধ্যে একটি ছিল হালদার পরিবারের। সেটি এখনও সযত্নে রাখা আছে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে হালদার পরিবারের সদস্যদের স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। ষাটের দশকে ভূদান যজ্ঞের সময়ে আচার্য বিনোবা ভাবে বেশ কিছুদিন হালদার বাড়ির দোতলায় অবস্থান করেছিলেন।

দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে প্রতিমার কাঠামো পূজা হয় এবং আগে প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠীর মধ্যে কাঠামোর কাঠ সংগ্রহ ও সূত্রধর দিয়ে কাঠামো তৈরি করে রাখা হয়। মহাষ্টমীতে কাঠামো পূজার পর মৃৎশিল্পীকে বায়না দেওয়া হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা থেকে ঠাকুরদালানেই প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। কুমোরটুলির একই পরিবারের শিল্পী তিনপুরুষ ধরে এদের প্রতিমা তৈরি করছেন।

ডাকের সাজে সজ্জিতা দক্ষিণাকালী মূর্তি। কৃষ্ণনগর থেকে দুই জন শিল্পী (বিজয় ঘোষ ও বাবলু বসু) এসে প্রতিমাকে সাজান, যে সাজ সত্যিই দৃষ্টিনন্দন। শিল্পী বাবলু বসু ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। পিছনের চালচিত্রও দর্শনীয়। হালদার বাড়ির কালীপূজায় কিছু প্রাচীন প্রথা আজও বজায় আছে। পূজা শুরুর মুহূর্তে বাড়ির সব বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে মণ্ডপ এবং সমস্ত বাড়িতে মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়। সে এক অভাবনীয় মায়াবী পরিবেশ, চাক্ষুষ না করলে অনুভব করা যায় না। আগে পশুবলির প্রথা থাকলেও ১৯৪৬ সাল থেকে বলি বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে হয় আখ, শশা ও চালকুমড়ো বলি। পুরনো রীতি মেনে মশালের আলোয় সম্পন্ন হয় বলিদান পর্ব। দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় লুচি, পঞ্চব্যঞ্জন ও মিষ্টি। সংকল্প হয় বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের নামে।

শোনা যায়, আগে কালী প্রতিমার জিহ্বা সমান উচ্চতা পর্যন্ত দশ মণ চিনির নৈবেদ্য দেওয়া হতো। এখন দেওয়া হয় দুই মণ। তবে এক মণ দশ সের চালের নৈবেদ্য আজও দেবীকে নিবেদন করা হয়। কোনো দেবোত্তর সম্পত্তি নেই। যৌথ পরিবারে সবাই মিলে পূজার দায়িত্ব পালন করেন।

বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকলেও হালদার বাড়ির পূজায় নিষ্ঠা, ভক্তি ও আন্তরিকতার অভাব নেই। হালদার বাড়ির ঐতিহ্যময় 'দক্ষিণাকালী' মাতাকে দর্শন করতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হতো নৌকায় করে মাঝগঙ্গায় নিয়ে গিয়ে। বর্তমানে প্রশাসন থেকে অনুমতি না মেলায় হালদার পরিবার বিসর্জনের সেই রীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। □

ভারতে শক্তিসাধনার ইতিহাস

ড. অনিমেষ চক্রবর্তী

(পর্ব - ১)

ভারতে শক্তিপূজার ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত। খ্রিস্টপূর্ব সাত হাজার বছরেরও আগে প্রাচীন রাজস্থানের সাম্ভর প্রভৃতি স্থানে কৃষিকাজের শুরুর নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে (৭০০০–৫০০০ খ্রিস্টপূর্ব) পূর্ব ও উত্তর ভারতে কৃষিকাজ ও ধান উৎপাদনের নিদর্শন পাওয়া যায়। কৃষিজাত দ্রব্য গম, বার্লি, ধান, রাগি, তৈলবীজ, তুলা, মটর, খেসারি, কলাই, মসুর, মুগ প্রভৃতি উৎপাদনের নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম ও মধ্যভারতে।

এই সময়ের মধ্যে মৃৎপাত্র, পাথরের কুড়ুল, মাটির বাড়ি, পশুপালন প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর পশ্চিমভাগ, উত্তর, পূর্ব, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ প্রভৃতি সর্বত্র এর নির্দশন পাওয়া যায়। সরস্বতীর তীরে, বোলান নদীর তীরে এবং মেহরগড় ও তার আশেপাশে গ্রামীণ বসতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই গ্রামীণ জীবনবোধ ও সংস্কৃতি থেকেই পরবর্তীকালে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিনহাজার বছর আগে ভারতবর্ষে গড়ে উঠতে থাকে হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, ধোলাবীরা, কালিবঙ্গান, লোথাল, নাল, আমরি প্রভৃতি নগর ও নাগরিক সভ্যতা। প্রায় দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই সভ্যতার অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল প্রাথমিকভাবে কৃষিকাজ ও পশুপালন এবং পরবর্তীকালে কিছু শিল্পবস্তু নির্মাণ ও বাণিজ্য।

কৃষিকাজ আবিষ্কার করেছিল ভারতের মেয়েরাই। এরেনফেলস্ লিখেছেন, মেহগিনের মতে নব্যপ্রস্তর যুগে যে পাথরের কুড়ুল সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল তা তৈরি করেছিল ভারতের মেয়েরাই।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োতে দেখা যায় মাতৃদেবতার আরাধনার প্রাবল্য। এর শুরু নব্যপ্রস্তর যুগে। আবার লোথাল, কালিবঙ্গান, রাখিগড়ি প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায় অগ্নিকুণ্ড, শিবলিঙ্গ, পশুবলিদান, দুটি শিংযুক্ত দেবমূর্তি অথবা যোগীমূর্তি ধ্যানাসনে বসা। অশ্বত্থ পাতার ছবি পাওয়া যায়। স্বস্তিক চিহ্ন ও ছবি পাওয়া যায়। ষাঁড়ের মূর্তি পাওয়া যায়। ধ্যানাসনে বসা যোগীমূর্তি পশুপতি বা শিব বলে অনুমিত হয়। লিঙ্গ পূজার নিদর্শন পাওয়া যায়। মাতা পার্বতী অথবা মাতৃদেবীর পূজা হরপ্পা সভ্যতার অনেক আগে থেকে প্রচলিত ছিল। জোব উপত্যকায় মাতৃকাদেবী মূর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গাছের ছবি পাওয়া যায়। মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। নাগের ছবি পাওয়া যায়। গাছের সঙ্গে নাগ, ভক্তিনম্র অবস্থায় বসা মানুষের পেছনে নাগ প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

একরকম নারীমূর্তির কোলে সন্তান, আর একরকম নারীমূর্তির গর্ভে সন্তান এরকম মাটির মূর্তি হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতায় পাওয়া যায়। সন্তান কামনায় মেয়েরা ওইরকম সন্তানবতীর মূর্তি মানত করতো বলে মনে হয়। আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, মাতৃত্বের কামনায় মাতৃমূর্তি মানত করবার প্রথা দেখা যায়। সন্তান কামনা ছাড়াও এই মাতৃমূর্তিগুলির সঙ্গে ফসল কামনামূলক বিশ্বাসের যোগাযোগ থাকা সম্ভব বলেই মনে হয়।

শাক্ত ধ্যানধারণার কেন্দ্রে এক মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার কেন্দ্রে নারীশক্তির প্রাধান্য ছিল বলেই মনে হয়। কারণ সন্তান উৎপাদন ও পালন এবং কৃষি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মেয়েদেরই ছিল প্রধান দায়দায়িত্ব, যোগ্যতা ও প্রাধান্য। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে যে সকল উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে তা পুরোপুরি চরিত্রগতভাবে ভারতীয়। সম্প্রতি হরপ্পা

সভ্যতাকেন্দ্রের রাখিগড়ি অঞ্চলের সমাধিক্ষেত্রে নারী দেহবশেষ ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে, এরা ছিলেন স্থানীয় মানুষ। বর্তমান কালের হরিয়াণার অধিবাসীদের মতোই তাঁদের শরীরের গঠন ছিল।

প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাক্‌বৈদিক যুগে যেমন শিব-শক্তি উপাসনার চল ছিল, বৈদিক যুগেও তেমন শক্তিপূজা ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত থেকে বৈদিক যুগে শক্তিসাধনার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো না কোনো পার্থিব প্রয়োজন মেটাবার তাগিদ থেকেই হয়তো শক্তিসাধনার উদ্ভব।

মানত করে দেবীর কাছে কিছু কামনা করা হলো। কামনাপূরণ হবার পর সেই মানত পূরণ করার পালা। এর পেছনে আছে এক ধরনের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান। এই বিশ্বাসকে জাদুবিশ্বাসও বলা যায়।

ভিলেনডর্ফের ভেনাসমূর্তি, এস্টেক্‌স্‌রা যে বসুমাতার মূর্তি কল্পনা করে এবং গ্রিক দেবলোকের আর্টেমিসও আদিতে বসুমাতা ছিলেন। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের বিভিন্ন নারীমূর্তির ভেতর নারীজননাঙ্গকেই বড়ো করে দেখান হয়েছে, স্ফীত-স্তন সহ। মহেঞ্জোদাড়োর মানুষেরা এই জাতীয় যোনিমূর্তি (মাতৃমূর্তি বা দেবীমূর্তি) তৈরি করেছিল। কারণ এর পেছনে ছিল প্রজননের কামনা, সন্তানের কামনা। ছিল ধনোৎপাদনের কামনা। এমন মনে হয় কৃষিকাজের সাফল্য কামনাও ছিল।

হরপ্পায় পাওয়া সিলটি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে এই ভেবে যে, একটি নারীমূর্তির দুটি পা দু'দিকে ছড়ানো, তার গর্ভের (মাতৃস্থান) ভেতর থেকে একটি লতা গজিয়েছে। হরপ্পার এই সিল থেকে সেই সময়ের মানুষের বিশ্বাস আর শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূর্তি রহস্যে বলা (শাকম্ভরী শতাক্ষী স সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা। উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকেশা চ পার্বতী।।) শ্লোকের অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। অর্থাৎ সেই প্রত্নপ্রস্তর যুগ ও তার আগে থেকেই নারী, নারী মাতৃস্থান এক শক্তির আধার বলে কল্পিত। সমস্ত উৎপাদনশীলতার উৎস, সন্তান, সমস্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, ঔষধি, সকল রকম চিন্তার উৎস এবং আনন্দের উৎস বলে মানুষ কল্পনা করে এসেছে। দেবী রহস্যের সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়া, উদ্ভিদ জগৎ, কৃষি জগৎ, অন্ন (অন্নম্ প্রাণঃ) বস্ত্রের সংস্থান ও উৎপাদনের সম্পর্ক আছে বলেই দেবীর নাম হয় শাকম্ভরী, দেবীর নাম হয় অন্নপূর্ণা। সেই পরমেশ্বরী শাকম্ভরী উজ্জ্বল কান্তিযুক্তা, শতনয়না। তিনিই দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা। শাকম্ভরী দেবীকে স্তব, ধ্যান, জপ, পূজা ও প্রণাম করলে শীঘ্র অনুপানরূপ অমৃত ফল লাভ হয়। আজও ফসল বোনার আগে, ভূমি কর্ষণের আগে ঘরের বউ-মেয়েরা অতি গোপনে মনের বাসনা জানিয়ে পূজো করে আসে শস্যক্ষেতের দেবীকে, প্রার্থনা জানায় উর্বর শস্যের। আবার ফসল ওঠার পর, গ্রামের একধারে কোনো এক রাতে দেবীর মূর্তি তৈরি করে পূজা করা হয়। গোটা গ্রাম তাতে যোগ দেয়। বিশ্বাস এই যে, দেবী সমস্ত ফসল রক্ষা করবেন। ভারতের ও বিশেষত বঙ্গের বিভিন্ন ব্রত যেমন ভাদো ব্রত, শস্পাতার ব্রত এবং আরও নানা ব্রতে এই কৃষি, ফসল, সন্তান, সুখ সমৃদ্ধির সাফল্য কামনার কথাই বিবৃত। এই ব্রতগুলির অনেকাংশই বেদের চেয়েও পুরনো। মেয়েদের দ্বারা তৈরি এবং মেয়েদের ব্রত।

এই জগৎ, এই প্রাণীজগৎ, এই উদ্ভিদজগৎ সমস্ত কিছুই দেবীর প্রকাশ। দেবী থেকেই সব সৃষ্ট। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, দেবী বলছেন— 'আত্মদেহসমুদ্ভবৈ'। দেবী থেকেই এই জগতের সৃষ্টি এবং তিনি এই জগতের ভেতরেই বাস করেন। দেবীই দেশ ও জগৎ হয়েছেন। আবার তিনিই দেশমাতৃকা ও জগৎমাতৃকা রূপে পূজিতা।

এই প্রসঙ্গে দুর্গাপূজার কথা একটু বলা যায়। দুর্গা আদিতে ছিলেন শস্যদেবী। শস্য বপন (রোপণ), শস্য আহরণের মধ্যেই ছিল দেবীপূজার আয়োজন। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকার পূজা একটি আবশ্যিক অঙ্গ। এই অনুষ্ঠানটি অবশ্যই কৃষি ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। রম্ভা, কচ্চি, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান ও ধানের পাতা দিয়ে নবপত্রিকা তৈরি কর হয়। এই নয়টি উদ্ভিদের প্রত্যেকটিকেই এক একজন দেবী বলে কল্পনা করা হয়। নবপত্রিকা স্থাপন এবং দুর্গাপূজার এই পর্যায়ে কৃষি ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক চোখে পড়ে। সর্বতোভদ্রমণ্ডল যন্ত্র অঙ্কিত বেদীর মধ্যে অষ্টদল পদ্মের উপর এক অঞ্জলি শুক্লধান্য প্রদান করে ঘট বসাতে হয়। ঘটে শুদ্ধজল বা তীর্থজল, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, সুবর্ণ প্রদান করতে হয়। ঘটের মুখে পঞ্চপল্লব যথা—আম, অশ্বত্থ, অশোক, বট, ডম্বরপল্লব দিতে হয়। তার উপরে একসরা আতপ তণ্ডুল, তার উপরে স্বস্তিক অঙ্কিত সশীষ ডাব, তারপর বস্ত্র প্রদান করতে হয়। সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক অঙ্কন করে ভূমি স্পর্শ করে পাঠ করতে হয় —

ওঁ ভূরসি, ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্ব ভুবনস্য ধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃগুঁহ, পৃথিবীং মাহিগুঁসীঃ।।

বলা হচ্ছে—দেবী, তুমি বিশ্বভুবনের ধাত্রী, এই ধরিত্রীর ধাত্রী, এই পৃথিবী প্রকৃতি তোমা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, এবং তুমি এই সৃষ্টির সঙ্গেই বাস করো। তোমাকে আমরা এখানে আবাহন করছি।

এখানে প্রয়োজনীয় সকল কিছু কৃষি ও উদ্ভিদজগৎ থেকে নেওয়া। নবপত্রিকাকে দুর্গাপ্রতিমার ডান দিকে অতি যত্নে সসম্মানে স্থাপন করা হয়। নবপত্রিকার প্রতিটি বৃক্ষকে এক একটি দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজা করা হয়।

রম্ভা—ওঁ হ্রীঁ রম্ভাধিষ্ঠাত্র্যৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ।

কচ্চি—ওঁ হ্রীঁ কচ্ব্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কালিকায়ৈ নমঃ।

হরিদ্রা—ওঁ হ্রীঁ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।

জয়ন্তি—ওঁ হ্রীঁ জয়ন্ত্যধিষ্ঠাত্র্যৈ কার্ত্তিক্যৈ নমঃ।

বিল্ব—ওঁ হ্রীঁ বিল্বাধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ।

দাড়িম্য—ওঁ হ্রীঁ দাড়িম্যধিষ্ঠাত্র্যৈ শিবায়ৈ নমঃ।

অশোক—ওঁ হ্রীঁ অশোকাধিষ্ঠাত্র্যৈ শোকরহিতায়ৈ নমঃ।

মান—ওঁ হ্রীঁ মানধিষ্ঠাত্র্যৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ।

ধান—ওঁ হ্রীঁ ধান্যাধিষ্ঠাত্র্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

ওঁ হ্রীঁ নবপত্রিকাবাসিন্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।

নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদুর্গা। তিনি এই কৃষিভিত্তিক জনজীবনে সমস্তরকম ধন ও সফলতার অধিষ্ঠাত্রী ও প্রতীক। তিনি এই সকল কিছুর ভেতর বাস করেন। তাঁর থেকেই উদ্ভিদ সৃষ্টি এবং তিনিও উদ্ভিদ থেকে সৃষ্ট।

কুল্লুকভট্ট মনুস্মৃতির ব্যাখ্যায় বলেছেন, শ্রুতি দুই রকম—বৈদিক ও তান্ত্রিক। শক্তি

সাধনার সঙ্গে শাক্ত দার্শনিক তত্ত্ব সম্পৃক্ত। প্রত্যক্ষভাবে শক্তিসাধনা বলতে তান্ত্রিক সাধনাকেই বোঝায়। শক্তিসাধনা সাধককে দেহে ও মনে শক্তিশালী করে তোলে। সাধনার ধাপগুলি হলো—সাধক, সাধ্য ও সাধনোপায়। শক্তিসাধনা প্রধানত গৃহস্থের সাধনা। ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ সাধককে বলা হয় গৃহাবধূত, আর সর্বোচ্চ স্তরের শক্তি সাধককে বলা হয় কুলাবধূত। কুলাবধূত প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে হংস বা পরমহংস হয়ে যান। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁকেই সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ বলা হয়েছে।

পশু, বীর ও দিব্যভাবের মধ্যে শক্তি সাধনার সর্বোচ্চ স্তর দিব্যভাবের সাধনা। স্থান অথবা চরিত্র বিশেষে তন্ত্রের তিনটি প্রধান সম্প্রদায়—গৌড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরি। পরব্রহ্মস্বরূপিনী মহাশক্তি শক্তি সাধনার সাধ্যা। তাঁকেই বিভিন্ন সাধনোপায়ের মাধ্যমে পাবার চেষ্টাই হচ্ছে সাধকের সাধনা। এই শক্তি মহাশক্তির বহুরূপ। তিনি সর্বদেবময়ী। তবে প্রধানত দশমহাবিদ্যারূপেই তিনি শক্তিসাধনায় সাধিত হন। এই দশমহাবিদ্যা বলতে—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। (কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।। বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।)। দশমহাবিদ্যার মধ্যে আবার কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরীর সাধনা বিশেষভাবে প্রচলিত। দশমহাবিদ্যার দেবী কালী এবং গৃহস্থ-পূজিতা দেবী দক্ষিণাকালীর রূপকল্পনা ও পূজাপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। দশমহাবিদ্যা তত্ত্বে বর্ণিত দেবী কালীর সাধনার একমাত্র অধিকার সূক্ষ্মশরীরে অবস্থানকারী উচ্চকোটির সাধকদের।

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি কালী। সকল বর্ণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে হয় কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ লয়াত্মিকা শক্তি। মহাপ্রলয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চ মহাকালী বা মহাপ্রকৃতিতে লয় হয়। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলের মতে— কলন অর্থে গ্রাস করা। আবার কলন অর্থে স্পন্দিত হওয়া, স্বরূপচ্যুত হওয়া, কুণ্ডলিনী থেকে পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া বোঝায়।

দক্ষিণ ভারতে কালী বা মহাকালী শ্রীবিদ্যা, ললিতা বা ষোড়শী নামে পরিচিতা। কাশ্মীরের 'শ্রীনগর' হলো শ্রীবিদ্যা সাধনার একটি প্রাচীন কেন্দ্র। মহাকাল সংহিতা অনুসারে কামকলাকালী একদিক থেকে ভদ্রকালী বা শ্মশানকালী কিংবা গুহ্যকালী। মহাকালসংহিতা মতে কালী নয় রকমের যথা—দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধনকালী, সিদ্ধকালী ও চণ্ডকালী।

শক্তিসাধনা সম্পর্কিত বিভিন্ন উপায় তন্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রথমে দীক্ষাগ্রহণ, তারপর জপ, তারপর পূজা। তবে দীক্ষালাভ, জপ, পূজা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মত ও পথ আছে।

যন্ত্র দেবতার প্রতীক শুধু নয়, দেবতার রূপ, দেবীর অবয়ব, দেবীর শরীর। দেবী সাধকের ভাব ও ভক্তি অনুযায়ী যন্ত্রে প্রকাশমান হন। দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র আছে। এ সাধনা দেবীকৃপা হলে সম্ভব। কথামৃতে আছে— 'সাধ্য-সাধনার পর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা, আর সুযুম্না নাড়ী— সুযুম্নার মধ্যে ছটি পদ্ম আছে। ঈড়া, পিঙ্গলার গতি বা শক্তিপ্রবাহ নিম্নাভিমুখী। একমাত্র সুযুম্না ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন। সুযুম্নার সর্বনীচে মূলাধার, তারপর স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে ষট্‌চক্র বল হয়।

কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর–এইসব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে হৃদয়মধ্যে অনাহত পদ্ম, সেখানে এসে অবস্থান করে। তখন চৈতন্য হয় আর জ্যোতি দর্শন হয়।

বিশুদ্ধ চক্র পঞ্চম ভূমি। এখানে মন উঠলে কেবল ঈশ্বর কথা বলতে আর শুনতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এই চক্রের স্থান কণ্ঠ।

তারপর ষষ্ঠভূমি। আজ্ঞাচক্র দ্বিদল পদ্ম। এখানে কুলকুণ্ডলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। তারপর সপ্তমভূমি। সহস্রার পদ্ম। সেখানে কুণ্ডলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রারে সচ্চিদানন্দ শিব শক্তির সাথে মিলিত হন। শিব-শক্তির মিলন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—৩ আগস্ট, ১৮৮৪, ২০শে শ্রাবণ)

কুলকুণ্ডলিনীর অর্থ অব্যক্তা শক্তি। এই কামকলা শক্তি। কামকলা অর্থে অব্যক্ত ও সৃষ্টিবীজরূপিণী। কাম অর্থে শিব বা পরম শিব আর কলা অর্থে বিমর্শ শক্তি অর্থাৎ কালী।

কুণ্ডলিনীই কামকলা। কারণ অবস্থায় এই শক্তি বিশ্বের সকল প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে নিহিত। তন্ত্রে এই শক্তি তেজোময় বিদ্যুল্লতাকারা; এই কুণ্ডলিনীই ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়ারূপিণী (অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য) শক্তি। সত্ত্ব, রজঃ, তমো তিনগুণের মিলন। এই জন্যই বিমর্শশক্তি কলা ত্রিগুণাত্মিকা। মা, ত্রিগুণ স্বরূপিণী মা।

কালিকাপুরাণে আছে—প্রবাসে, পথে, দুর্গমস্থানে স্থানের অলাভে, জলে নিরুদ্ধাবস্থায়, সকল অবস্থায় জ্ঞানী দেবী মহামায়ার মানসী পূজা করবে। মনে মনে হৃদয় মধ্যে যোগপীঠের ধ্যান করে সেই যোগপীঠেই পূজার অনুষ্ঠান করবে।

তন্ত্রের মূলকথা, মা মহামায়ার কৃপায় সদ্‌গুরু লাভ করা, আর সদ্‌গুরুর প্রসাদে মুক্তিলাভ। তন্ত্রে আছে অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। তন্ত্র এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক দর্শন। আসল কথা হলো শ্রীগুরুর প্রসাদে মুক্তিলাভ।

আরাধনায় দেবী সন্তুষ্ট হলেই সাধকের মনে, সাধকের চিদাকাশে উজ্জ্বল সূর্যের মতো বিচাররূপতা সাধককে দান করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে জানা যায়— তিনি গাইছেন ফলহারিণী পূজা দিবসে—

'তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য মা, তুমি যে পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা, দ্বাদশ গোপাল।
দশমহাবিদ্যা মাতা দশ অবতার।
এবার কোনরূপে আমায় করিতে হবে পার।'

সর্বদেবময়ী পরাশক্তি। মহানির্বাণতন্ত্রে সদাশিব বলছেন, দেবী, তুমি কালী, তারিণী, দুর্গা,ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, অন্নপূর্ণা,বাগ্‌দেবী ও কমলালয়া। তুমি সর্বশক্তিস্বরূপা।

দেবীপূজায়, তন্ত্রশাস্ত্রে ভাবই প্রধান। ভাব থাকলেই দেবীকৃপা লাভ হয়। ভাবে মুক্তিলাভ হয়, কুলবৃদ্ধি গোত্রবৃদ্ধি হয়। ভাবের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান থেকে মোক্ষলাভ হয়। ভাব সর্বশাস্ত্রের গূঢ় বস্তু। সাধক যখন সমস্তের মূলভূত দেবীভাব লাভ করেন তখন তাঁর সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। *(ক্রমশ)*

ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে শতবর্ষ যাবৎ রাষ্ট্রসেবায় রত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

ডাঃ মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক,রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী যে কার্যসূচির যোজনা রয়েছে, তার শুভসূচনা হিসেবে এই বিজয়াদশমী উপলক্ষ্যে আমরা আজ একত্রিত হয়েছি। ঘটনাক্রমে গুরু তেগবাহাদুর মহারাজের পূত আত্মাহুতির ৩৫০তম বার্ষিকী এই বছরেই উদ্‌যাপিত হবে। তাঁর এই বলিদান বিদেশি, বিধর্মীদের অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দুসমাজকে 'হিন্দ্ কা চাদর' (হিন্দুস্থানের ঢাল-স্বরূপ) হয়ে রক্ষা করেছিল। ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আজ মহাত্মা গান্ধীর ১৫৬তম জন্মবার্ষিকী। তিনি কেবল আমাদের স্বাধীনতার পথিকৃৎদের অন্যতমই ছিলেন না, বরং স্বাধীনতালাভের পরবর্তী পর্যায়ে 'স্ব' (নিজস্বতার)-এর ভিত্তিতে নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নদ্রষ্টাদের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন। আজ ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীরও জন্মদিন। তিনি সরলতা, বিনম্রতা, সততা এবং দৃঢ়তার মূর্ত প্রতীক। তিনি দেশের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন।

ভক্তি, সমর্পণ ও রাষ্ট্রসেবার এই মহৎ আদর্শ আমাদের সকলের অনুকরণীয়। যথার্থ মানুষ কীভাবে হওয়া যায় এবং কেমন করে আদর্শ জীবন যাপন করতে হয়— এই শিক্ষা আমরা এই মহাপুরুষদের থেকে পাই।

বর্তমানে দেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতিও ভারতীয়দের সামনে এই প্রকার ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চরিত্রবলে সমৃদ্ধ জীবনযাপনের দাবি তুলে ধরছে। বিগত বছরগুলিতে স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রাপথের পুনরাবলোকন করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বর্তমান পরিস্থিতি— আশা ও চ্যালেঞ্জ

বিগত কালখণ্ড একদিকে যেমন বিশ্বাস ও আশাকে দৃঢ় করেছে, অন্যদিকে আমাদের সম্মুখে পুরনো ও নতুন বাধা বা সমস্যাগুলোকে আরও সুস্পষ্টভাবে উন্মুক্ত করে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্যপথের দিশাও নির্দেশ করেছে।

এই বছর প্রয়াগরাজে আয়োজিত পূর্ণমহাকুম্ভে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে তীর্থযাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বিশ্বময় বৈভবের আদর্শ তুলে ধরেছে। ভারতবর্ষ যেন প্রদর্শন করেছে তাঁর প্রকৃত শক্তি। সম্পূর্ণ ভারতে শ্রদ্ধা ও ঐক্যের এক প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস জাগিয়েছে এ বছরের পূর্ণমহাকুম্ভ।

গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসবাদীরা ধর্ম জিজ্ঞাসা করে ২৬ জন ভারতীয় পর্যটককে হত্যা করেছে। তার প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষের নাগরিকদের মধ্যে দুঃখ ও ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছিল। ভারত সরকার সুপরিকল্পিতভাবে মে মাসে এই আক্রমণের যথার্থ জবাব দিয়েছে। এই কালখণ্ডে দেশের নেতৃত্বের দৃঢ়তা এবং সেনাবাহিনীর পরাক্রম ও রণকৌশল প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একতার সুখপ্রদ দৃশ্যও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সঙ্গে এই কথাও বুঝতে পেরেছি যে, সকলের সঙ্গে মিত্রতার নীতি বজায় রাখার পরও নিজেদের সুরক্ষার ব্যাপারে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে এবং শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নীতিগত

কার্যকলাপের দ্বারা এই পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে যে, কোন কোন দেশ কতদূর পর্যন্ত আমাদের মিত্র।

দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী ও মাওবাদী কার্যকলাপের ওপর সরকার ও প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ এবং সাধারণ মানুষের চোখে তাদের বিচারধারার অন্তঃসারশূন্যতা ও নিষ্ঠুরতা ধরা পড়ে যাওয়ার কারণে এহেন কার্যকলাপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে মাওবাদীদের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল শোষণ ও অন্যায়, উন্নয়নের অভাব এবং এই সমস্ত বিষয়ে প্রশাসনিক সংবেদনশীলতার অভাব। এখন এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। এই সমস্ত এলাকায় সামাজিক ন্যায়বিচার, উন্নয়ন, সদ্ভাবনা, সহানুভূতি ও সমরসতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অর্থনীতির বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে আমরা বলতে পারি। আমাদের দেশ বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক--- সাধারণ মানুষের মধ্যে জেগে ওঠা এরকম ভাব ও উৎসাহ শিল্পপতি-সহ নতুন প্রজন্মের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। তবে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি, আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, শোষণের জন্য শোষকদের নতুন তন্ত্র সৃষ্টি, পরিবেশ দূষণ, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও অমানবিকতা বৃদ্ধি ইত্যাদি গুরুতর সমস্যাগুলি ইদানীং তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই সমস্যাগুলি যেন আমাদের এগিয়ে চলার পথে বাধা না হয়। সম্প্রতি আমেরিকা নিজের স্বার্থের ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে যে নতুন শুল্কনীতি গ্রহণ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব। কিন্তু জাগতিক জীবনের অখণ্ডতা, অভিন্নতা, সাদৃশ্য ও সরলরৈখিকতার কথা মাথায় রেখেই আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে যাতে বিশ্বের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আমাদের দুর্বলতা না হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা নিজ ইচ্ছানুসারে জীবনযাপনে সক্ষম হই। স্বাদেশিকতা ও স্বাবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই।

আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্বদেশি জীবনধারা অবলম্বন বিশেষ আবশ্যক। স্বাদেশিকতাকে কেন্দ্র করে চলতে থাকলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক গুরুত্বদানও অতীব প্রয়োজনীয়। স্বাদেশিকতাকে পাথেয় করে অগ্রসর হলেও বিশ্বজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার এই ভাব আমাদের পথ চলার ক্ষেত্রে দুর্বলতার পরিচায়ক হবে না, বরং তা হবে আমাদেরই ইচ্ছানুসারে; তা সম্পূর্ণভাবে থাকবে আমাদের ইচ্ছাধীন। বিশ্বজনীনতার প্রতি তা হবে আমাদের শ্রদ্ধার পরিচয়।

বস্তুবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী-ভিত্তিক জড়বাদী ও ভোগবাদী উন্নতির নীতি আজ সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত। তার ক্ষতিকর প্রভাব সর্বত্র বেড়েই চলেছে। সেই নীতির পরিণামস্বরূপ বিগত তিন-চার বছর ধরে ভারতবর্ষেও হয়ে চলেছে অনিয়মিত তথা অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্প, ভূমিক্ষয়, হিমবাহ শুকিয়ে যাওয়া, তুষারধস ইত্যাদি। এই নীতির ভয়াবহ পরিণাম হয়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন, যা বর্তমানে এক তীব্র আকার ধারণ করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত জলস্রোতের উৎস হিমালয়। সেই হিমালয়ে সাম্প্রতিককালে প্রতি বছর এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির জন্য সতর্কতা-সূচক বার্তা হিসেবে ধরে নেওয়া উচিত।

বিগত কয়েক বছরে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং সম্প্রতি নেপালে যেরকম হিংস্র জনরোষের উদ্রেকের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হলো সেটি আমাদের জন্যও উদ্বেগজনক। আমাদের দেশে এবং বিশ্বে এমন অনেক শক্তি সক্রিয় রয়েছে যারা চায় যে ভারতেও এইরকম উপদ্রব তৈরি হোক। সরকার ও সমাজের মধ্যে দূরত্ব এবং দক্ষ ও জনকল্যাণমুখী প্রশাসনিক কার্যকলাপের অভাব এই ধরনের অসন্তোষের স্বাভাবিক ও তাৎক্ষণিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু হিংসা ও জনরোষের দ্বারা বাঞ্ছিত পরিবর্তন আসে না। গণতান্ত্রিক পথেই সমাজের আমূল পরিবর্তন সম্ভব। অন্যথায় এই ধরনের ঘটনায় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের খেলা অব্যাহত রাখার সুযোগ খুঁজবে এবং এই ধরনের সম্ভাবনা বার বার তৈরি হবে। আমাদের এই সমস্ত প্রতিবেশী দেশ সংস্কৃতিগতভাবে এবং নাগরিকদের পারস্পরিক নিত্য সম্পর্কের দৃষ্টিতে ভারতের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। এক প্রকার এরা আমাদের পরিবারেরই অংশ। সেখানে শান্তি, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি, সুখ, সুবিধার ব্যবস্থা অটুট থাকা আমাদের স্বার্থরক্ষার থেকেও বেশি জরুরি, কারণ তা হলো আমাদের স্বাভাবিক আত্মীয়তার চাহিদা।

বিশ্বের সর্বত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি, মানব জীবনের বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাকে আরামদায়ক করে তোলার উপযুক্ত প্রযুক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণে বহু দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা নৈকট্যের মতো ইতিবাচক দৃশ্যও আজ বিশ্বজুড়ে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার গতির অনেক পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। সেজন্য সাধারণ মানুষের জীবনে অনেক প্রকার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সর্বত্র চলতে থাকা বিভিন্ন ছোটো-বড়ো যুদ্ধ, পরিবেশ দূষণের কারণে প্রকৃতির উগ্র প্রকোপ, সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা, নাগরিক জীবনে বাড়তে থাকা অনাচার ও অত্যাচারের মতো সমস্যাও ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। এইসব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার প্রতিরোধ অথবা এই সমস্যাগুলির পরিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভবপর হয়নি। এই সমস্ত কিছুর কারণে তৈরি হওয়া বিকৃত মানসিকতা, কলহ, হিংসা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। অথচ সমস্ত রকম মাঙ্গলিক উৎসব-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, শ্রদ্ধা, পরম্পরা প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিনাশই পরবর্তীতে নিজে নিজেই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করবে— এইরকম বিকৃত, ধ্বংসাত্মক ও অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনাকে পাথেয় করে চলা মতাদর্শের প্রাদুর্ভাবের সংকটও বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই দেখা যাচ্ছে। ভারতেও আমরা

কম-বেশি এই সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছি। সমগ্র বিশ্ব এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত উপায়ের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

আমাদের সকলের আশা ও আশ্বাস জাগানোর মতো একটি বিষয় হলো, আমাদের দেশে সর্বত্র বিশেষত নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশভক্তির ভাবনা এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ ভাবনায় সমাজের সেবায় বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসছেন। ফলে ভারতীয় সমাজের আত্মনির্ভরতা, নিজ প্রচেষ্টায় সমস্যা সমাধানের প্রবৃত্তি, বিভিন্ন অভাব অনটন পূরণের দৃষ্টান্ত বাড়ছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উপলব্ধি হয়েছে যে, সঙ্ঘের কার্যক্রমে তথা সামাজিক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা সমাজের মধ্যে বাড়ছে। বিশ্বে উন্নয়ন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রচলিত ধারণার বাইরেও আমাদের দেশের জীবনদর্শন, প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে আমাদের পৃথক, স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ কী হতে পারে সেই বিষয়ে প্রবুদ্ধ সমাজের মধ্যেও গবেষণার প্রবণতা বাড়ছে।

ভারতীয় দার্শনিক ভাবনা

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত তথা বিশ্বের কথা চিন্তা করেছেন আধুনিক যুগের এমন সমস্ত মনীষী— স্বামী বিবেকানন্দ থেকে মহাত্মা গান্ধীজী, দীনদয়াল উপাধ্যায়জী, রামমনোহর লোহিয়াজী প্রমুখ ভারতীয় সমাজকে নেতৃত্বদানকারী মহাপুরুষ তৎকালীন ও সমকালীন বিভিন্ন সমস্যার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি একমুখী দিশা নির্দেশ করেছেন। আধুনিক বিশ্বের সামনে যে জীবনদর্শন রয়েছে সেটি পুরোপুরি ভুল নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। এজন্য তার মাধ্যমে কিছু দেশে এবং কিছু শ্রেণীর মানুষের হাতে পার্থিব সম্পদ সঞ্চিত হতে দেখা যাচ্ছে। অথচ সকলের মধ্যে কিন্তু তার বিস্তার হচ্ছে না। সকলের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া হয়, কেবল ভারতীয়দের যদি আমেরিকানদের মতো তথাকথিত সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনযাপন করতে হয় তাহলেও পাঁচখানি পৃথিবীর প্রয়োজন হবে বলে অনেক গবেষক মতপ্রকাশ করে থাকেন। আজকের এই পদ্ধতিতে আর্থিক বা বস্তুতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানবিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটেনি। সেজন্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির সামনে নতুন নতুন জীবন সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে। এর কারণ--- দৃষ্টিকোণের অসম্পূর্ণতা।

ব্যক্তির বস্তুতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মন, বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ; ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি তথা সৃষ্টির বিকাশ; মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও ইচ্ছার অনুরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি এবং সকলের প্রতি আত্মীয়তার অনুভব করানোর সামর্থ্য আমাদের সনাতন, আধ্যাত্মিক, সামগ্রিক ও একাত্ম দৃষ্টিকোণের মধ্যে রয়েছে। কারণ সকলকে যুক্ত করার মতো তত্ত্ব উপলব্ধির অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তার ভিত্তিতে হাজার হাজার বছর ধরে এই জগতে এক সুন্দর, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, পারস্পরিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া, মনুষ্য ও সৃষ্টির সহযোগী জীবনের আদর্শ উপস্থাপিত করেছিল ভারত। আমাদের সেই সামগ্রিক ও একাত্ম দৃষ্টির ভিত্তিতে বিশ্বের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে জগতের বর্তমান সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে এমন একটি নতুন ব্যবস্থা আজ জগতের প্রয়োজন। ভারতবাসী তাঁদের জীবনযাপনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এইপ্রকার ব্যবস্থার অনুকরণীয় আদর্শ জগতের সামনে উপস্থাপন করুক— বিধাতা আমাদের কাছে এমনটিই চাইছেন।

সঙ্ঘের ভাবনা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ শতবর্ষ অতিক্রম করলো। সঙ্ঘের থেকে সংস্কার ও প্রেরণা গ্রহণ করে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে এবং স্থানীয় স্তরে স্বয়ংসেবকরা সক্রিয় রয়েছেন। সমাজজীবনে সক্রিয় অনেক সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গেই স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতা ও যোগাযোগ রয়েছে। তাঁদের সকলের মিলিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঙ্ঘেরও কিছু পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত তৈরি হয়েছে—

With Best Compliments from :-

A

Well

Wisher

With Best Compliments from :

Orient Movietone Corporation Limited

CIN : L92142WB1946PLC013138

Regd. Office : 9A, Esplanade East, Kolkata - 700069

Phone : 2210-8763, 2248-3613

Fax : 033-2243-0751, E-mail : info@mkgroupindia.biz

(১) ভারতবর্ষের উত্থানের প্রক্রিয়ার গতি ক্রমবর্ধমান। কিন্তু আমরা এখনও সেই নীতি ও ব্যবস্থার ভিত্তিতেই চিন্তা করছি, যে নীতি ও ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার কথা তাদের বর্তমান পরিণাম থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একথা সত্য যে, এই পথে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমরাও এতটাই এগিয়ে গিয়েছি যে, একবারে হঠাৎ পরিবর্তন সম্ভব হবে না। একটি দীর্ঘ বৃত্তাকার পথে ধীরে ধীরে ঘুরতে হবে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সামনেও যে সমস্যা এবং ভবিষ্যতের বিপদ অপেক্ষা করছে— তার থেকে বাঁচার দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। আমাদের সামগ্রিক ও একাত্ম দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে উন্নয়নের পথ নির্মাণ করে জগতের সামনে একটি কীর্তিমান দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে। অর্থ ও কামের পিছনে অন্ধের মতো ছুটতে থাকা জগৎকে ধর্মের রাস্তা দেখাতে হবে, যে ধর্ম— পূজাপদ্ধতি ও রীতিনীতির ঊর্ধ্বে বিরাজমান; যে ধর্ম সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে পারে; যে ধর্ম সকলের সার্বিক উন্নতি করতে সক্ষম।

(২) সম্পূর্ণ দেশের এমন একটি আদর্শ চিত্র জগতের সামনে উপস্থাপন করার কাজ কেবল সরকার ও শাসন-ব্যবস্থার নয়। কারণ এই ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে পরিবর্তন করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য সীমিত। এর প্রেরণা ও নিয়ন্ত্রণের বীজ সমাজের প্রবল ইচ্ছার মধ্যে লুক্কায়িত। সেজন্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সমাজের জাগরণ প্রয়োজন। ব্যবস্থা পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হলো সমাজের আচরণের পরিবর্তন। সমাজের আচরণের পরিবর্তন ভাষণ দিয়ে বা বইপত্রের মাধ্যমে পুরোপুরি হয় না। সমাজে ব্যাপক জাগরণের প্রয়োজন হয়। জাগরণ যাঁরা ঘটাতে চাইছেন, সমাজের সামনে তাঁদের নিজেদেরকে পরিবর্তিত বা সংস্কারিত ব্যক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করতে হয়। বিভিন্ন স্থানে এরকম দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যক্তি, যাঁদেরকে সমাজ আপন বলে মনে করে, যাঁদের জীবনে স্বচ্ছতা রয়েছে, অন্তরে নিঃস্বার্থ মনোভাব রয়েছে, যাঁরা সমগ্র সমাজকে নিজের বলে মনে করে সমাজের সঙ্গে নিত্য সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার বজায় রেখেছেন— সমাজের সামনে আজ তাঁদের আসা প্রয়োজন। সমাজের মধ্যে সকলের সঙ্গে থেকে নিজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সমাজকে প্রেরণা দেবেন, এমন স্থানীয় সামাজিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। সেজন্য ব্যক্তিনির্মাণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যবস্থা পরিবর্তনের এই পদ্ধতিই দেশ তথা জগতে পরিবর্তনের যথার্থ পথ বলে স্বয়ংসেবকরা উপলব্ধি করেছেন।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন সমাজে এমন ব্যক্তি নির্মাণের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। আমাদের সমাজে বৈদেশিক আক্রমণের দীর্ঘ কালখণ্ডে এই সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেজন্য পরিবারে, শিক্ষা পদ্ধতিতে এবং সমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে পুনরায় যুগানুকূল ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই কাজ করার মতো ব্যক্তিনির্মাণ করতে হবে। মন ও বুদ্ধি দিয়ে এই চিন্তাধারাকে মানতে হবে এবং আচরণে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানসিকতা, কথাবার্তা ও কর্মের অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্য কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন। সঙ্ঘের শাখা হলো সেই ব্যবস্থা। একশো বছর ধরে সমস্ত রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই ব্যবস্থাকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সচল রেখেছেন এবং পরবর্তীতেও এই ব্যবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য স্বয়ংসেবকদের নিত্য শাখার কার্যক্রমগুলিকে মন দিয়ে করার মাধ্যমে নিজেদের অভ্যাস পরিবর্তনের সাধনা করতে হয়। ব্যক্তিগত সদ্‌গুণ এবং সামূহিকতার পরিবেশ নির্মাণের স্থান হলো সঙ্ঘের শাখা।

(৪) যেকোনো দেশের উত্থানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সেই দেশের সমাজের ঐক্য। আমাদের দেশ বিবিধতার দেশ। অনেক ভাষা, অনেক পন্থ, ভৌগোলিক বিবিধতার কারণে জীবনযাপনের অনেক রীতি, খাদ্যাভ্যাসের নানা ধরন, জাতি-উপজাতি প্রভৃতির বিভিন্নতা আগে থেকেই রয়েছে। বিগত কয়েক হাজার বছরে ভারতের সীমানার বাইরের বহু দেশ থেকেও অনেক বিদেশি সম্প্রদায় এদেশে এসেছে। বিদেশিদের শাসন এখন সমাপ্ত হয়েছে, বিভিন্ন বিদেশি সম্প্রদায়ের ভারতীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে। ভারতাত্মার সঙ্গে তাঁরা একীভূত হয়েছে। একদা বিদেশি ভাবধারা-জারিত এবং বিদেশি বংশোদ্ভূত হলেও বর্তমানে তাঁরা হয়ে উঠেছেন আমাদেরই স্বজন। ভারতাত্মায় বিলীন হওয়া এরকম বহু মানুষ বর্তমানে ভারতবর্ষে রয়েছেন। ভারতবর্ষের পরম্পরায় এঁদের সকলকে স্বাগত এবং সকলেই স্বীকার্য। এঁদেরকে কেউ পৃথক দৃষ্টিতে দেখে না। আমাদের বিবিধতাকে আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে 'গৌরব' হিসেবে মেনে নেওয়া আমাদের স্বভাবজাত। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য যেন ভেদবুদ্ধির হেতু না হয়। আমাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আমরা সকলে একটি বৃহত্তর সমাজের অঙ্গ। সমাজ, দেশ, সংস্কৃতি তথা রাষ্ট্রস্বরূপে আমরা এক ও অভিন্ন। আমাদের এই বৃহত্তর পরিচিতি আমাদের নিকট সর্বোপরি— এই কথাটি সর্বদা মাথায় রাখতে হবে। সেই কারণে সমাজে সকলের পারস্পরিক ব্যবহারে সদ্ভাবনা ও সংযম বজায় রাখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে সকলের নিজ নিজ শ্রদ্ধা, বিভিন্ন মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা তথা পূজনীয় বিষয় থাকে। মানসিকতা, কথাবার্তা ও কাজেকর্মে যাতে তাঁদের অপমান না হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। এই দিশায় সামাজিক জাগরণের প্রয়োজন রয়েছে। নিয়ম পালন, ব্যবস্থা মেনে চলা, সদ্ভাবপূর্বক ব্যবহার আমাদের স্বভাব হওয়া উচিত। ছোটো বড়ো কথায়, কিংবা কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে রাস্তায় নেমে পড়া, গুন্ডামি, হিংসা ইত্যাদি প্রবৃত্তি ঠিক নয়। মনের মধ্যে প্রতিহিংসার ভাবনা নিয়ে অথবা কোনো সম্প্রদায় বিশেষকে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য উসকানোর উদ্দেশ্যে এই ধরনের ঘটনা পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়। এই ধরনের উসকানিতে পা দেওয়ার পরিণাম, তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘকালীন— উভয় দৃষ্টিতেই ক্ষতিকর। এই ধরনের প্রবৃত্তিকে রুখতে হবে। সরকারকে পক্ষপাতশূন্য হয়ে, কোনোরকম চাপের মুখে নতিস্বীকার না করে, আইন মেনে নিজের কাজ করতে হবে। কিন্তু সমাজের সজ্জন শক্তি, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং

তরুণ প্রজন্মকেও সতর্ক ও সংগঠিত হতে হবে, কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

(৫) ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের ঐক্যের ভিত্তিকে 'ইনহেরেন্ট কালচারাল ইউনিটি' (অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক একতা) বলেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচীনকাল থেকেই সমস্ত বিবিধতাকে সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে শেখায়। কারণ এই সংস্কৃতি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সত্য এবং করুণা, পবিত্রতা, তপস্যার সদাচার, অর্থাৎ ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই দেশের সন্তানস্বরূপ হিন্দুসমাজ এই পরম্পরাকে নিজেদের আচরণে লালন করেছে। সেজন্য এই সংস্কৃতিকে 'হিন্দু সংস্কৃতি' বলা হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে ঋষিগণ নিজেদের তপোবলে এই সংস্কৃতির আবির্ভাব ও প্রচলন ঘটিয়েছেন। ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ ও সুরক্ষিত পরিবেশের কারণে তাঁরা এই কাজ করতে পেরেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিশ্রম, ত্যাগ ও বলিদানের কারণে এই সংস্কৃতি পুষ্পিত, ফলবতী হয়ে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আজ আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আমাদের সংস্কৃতির আচরণ, সেই সংস্কৃতির আদর্শস্বরূপ আমাদের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে হৃদয়ে গৌরব, কাজকর্মে সেই সংস্কৃতির বিবেকপূর্ণ অনুসরণ এবং এই সমস্ত কিছু যার কারণে সম্ভবপর হয়েছে, আমাদের সেই পবিত্র মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি— এইগুলি মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে আমাদের জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রচেতনা। বিবিধতাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃতি ও সম্মান জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকলকে এক মালিকায় গেঁথেছে হিন্দু রাষ্ট্রীয়তা। সেই রাষ্ট্রীয়তাই আমাদের সর্বদা ঐক্যবদ্ধ রেখেছে। আমাদের কল্পনা 'নেশন স্টেট'-এর নয়। শাসন ক্ষমতা আসে যায়, রাষ্ট্র নিরন্তর বিরাজমান। আমাদের একতার এটিই চিরন্তন ভিত্তি— এই কথা ভুললে চলবে না।

(৬) সম্পূর্ণ হিন্দুসমাজের সবল, সুশীল, সংগঠিত স্বরূপই এই দেশের একতা, বিকাশ ও সুরক্ষার চাবিকাঠি। হিন্দুসমাজ এই দেশের প্রতি দায়বদ্ধ সমাজ। হিন্দুসমাজ সর্ব-সমাবেশক। ওপরে-ওপরে অনেক রকম নাম ও রূপ দেখে নিজেদেরকে আলাদা মনে করে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ তৈরি করা 'আমরা-ওরা'র মানসিকতা থেকে এই সংস্কৃতি পুরোপুরি মুক্ত এবং চিরকাল মুক্তই থাকবে। হিন্দুসমাজ 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর উদার চিন্তাধারার ধারক, বাহক ও সংরক্ষক। সেজন্য ভারতকে বৈভবসম্পন্ন করে তোলা এবং সমগ্র বিশ্বে নিজেদের প্রয়োজনীয় ও যোগ্য অবদান রাখতে পারে এমন দেশরূপে বিকশিত করা হিন্দুসমাজের কর্তব্য। সংগঠিত সমাজ নিজেদের সমস্ত কর্তব্য নিজেদের ক্ষমতায় পালন করতে পারে। সেজন্য আলাদা করে অন্য কাউকে কিছু করতে হয় না।

(৭) সংস্কারিত, আদর্শ সমাজের চিত্রটিকে বাস্তবায়িত করতে হলে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় চরিত্র দৃঢ় করার প্রয়োজন। রাষ্ট্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও গৌরববোধ আমরা সঙ্ঘের শাখা থেকে লাভ করি। নিত্য শাখায় যে কার্যক্রম আয়োজিত হয়, তার দ্বারা স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, রাষ্ট্রভক্তি ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে।

সেজন্য শতাব্দী বর্ষে ব্যক্তিনির্মাণের কাজ যাতে দেশে ভৌগোলিক দৃষ্টিতে সর্বব্যাপী হয় এবং সামাজিক আচরণে স্বতঃসিদ্ধ পরিবর্তন আনতে সক্ষম 'পঞ্চ পরিবর্তন'-এর কার্যসূচি, যাতে স্বয়ংসেবকদের প্রয়াস এবং তাঁদের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে সমাজব্যাপী হয়ে ওঠে— সঙ্ঘ সেই চেষ্টা করবে। সামাজিক সমরসতা, পরিবার প্রবোধন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্ব-বোধ বা স্বদেশি চেতনা আধারিত জীবনরচনা এবং নাগরিক অনুশাসন অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান মেনে চলা বা নাগরিক শিষ্টাচার— এই পাঁচটি বিষয়ে ব্যক্তিজীবন, পরিবার জীবন ও নিজের আচরণে সদর্থক পরিবর্তন আনার জন্য সক্রিয় হতে হবে। সমাজে তাঁদের স্থাপিত দৃষ্টান্তের যাতে অনুকরণ হয়, এমনভাবে এই কার্যক্রমগুলির আয়োজন করতে হবে। এখানে যে কাজগুলি রয়েছে সেগুলি আচরণের দৃষ্টিতে সহজ ও সরল। বিগত দুই-তিন বছর সময়ে সঙ্ঘের কার্যক্রমে এর বিস্তারিত চর্চা হয়েছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের বাইরেও সমাজে অনেক সংগঠন ও ব্যক্তি এই ধরনের কার্যক্রম আয়োজন করছেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলার কাজ চলছে।

বিশ্বের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, ধর্মকে জগতের সামনে তুলে ধরার আখ্যান স্মরণ প্রয়োজন। এই ধর্ম বিশ্বের অন্তর্হিত সামঞ্জস্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে; এই ধর্ম বিশ্বজীবনে সংযম ও মর্যাদার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই কর্তব্যকেই বারবার পালন করার সাধনালব্ধ ফলস্বরূপ এই দেশ এবং এখানে বসবাসকারী বিবিধতাপূর্ণ সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে এক রাষ্ট্র রূপে স্থাপন করেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা রাষ্ট্রীয় নবোত্থানের পুরোধাদের সামনে স্বাধীন ভারতের সমৃদ্ধি তথা জাতীয় ক্ষমতার বিকাশের মঙ্গলময় পরিণামের এই চিত্রই প্রকট ছিল। আমাদের বঙ্গ প্রান্তের পূর্বতন সঙ্ঘচালক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন একজন স্বনামধন্য গীতিকার। তাঁর রচিত গানে সুন্দর ছন্দে তিনি সেই চিত্রের বর্ণনা করেছেন—

'বালী সিংহল যবদ্বীপে
প্রান্তর মাঝে ওঠে।
কত মঠ কত মন্দির
কত প্রস্তরে ফুল ফোটে।
তাদের মুখের মধুময় বাণী
শুনে থেমে যায় সব হানাহানি।
অভ্যুদয়ের সভ্যতা জাগে
বিশ্বের ঘরে ঘরে।'

আসুন, ভারতবর্ষের এই আত্মস্বরূপকেই আজকের দেশ-কাল- পরিস্থিতির সঙ্গে সুসঙ্গত শৈলীতে পুনরায় জগতের মাঝে দাঁড় করাই। পূর্বপুরুষদের দ্বারা প্রদত্ত এই কর্তব্য পালন এবং অধুনা বিশ্বের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য আমরা সম্মিলিতভাবে, পায়ে পা মিলিয়ে নিজেদের কর্তব্যপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আজকের বিজয়াদশমীর এই শুভমুহূর্তে সমস্ত সীমোল্লঙ্ঘনের কাজ সুসম্পন্ন করি।। ভারতমাতা কী জয়।।

(বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষ্যে নাগপুরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

বিশ্বচরাচরকে সর্বদা বিপন্মুক্ত করে থাকেন মা তারা

অভিজিৎ দত্ত

তন্ত্রসাধনার জন্য সাধারণত তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীরা অমাবস্যার রাতকেই বেছে নেন। তেমনই একটি হচ্ছে কৌশিকী অমাবস্যা। কথিত, বামাক্ষ্যাপা কৌশিকী অমাবস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কৌশিকী অমাবস্যা, অন্য সব অমাবস্যার থেকে একটু আলাদা। কারণ, তন্ত্র ও শাস্ত্র মতে ভাদ্র মাসের এই তিথিটি একটু বিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনেক কঠিন ও গুপ্ত সাধনা এই তিথিতে করলে আশাতীত ফল মেলে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে এই রাতের এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। তন্ত্র মতে এই অমাবস্যার রাতকে তারারাত্রিও বলা হয়। এই রাত্রে এক বিশেষ মুহূর্তে স্বর্গ ও নরক দুইয়ের দ্বার মুহূর্তের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং সাধক নিজের ইচ্ছামতো ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক শক্তি নিজের সাধনার মধ্যে আত্মস্থ করে ও সিদ্ধি লাভ করে। তাই তন্ত্রসাধনার জন্য এই অমাবস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

এই কৌশিকী অমাবস্যার রাতে মা কৌশিকী আর তারা মায়ের পূজা করা হয়। সাধারণত কৌশিকী কালী গৃহস্থের বাড়িতে পূজিত হন আর তারা মায়ের পূজা সাধারণত কোনো নির্জন স্থানে বা শ্মশানে করা হয়, কিন্তু আজকাল পাড়ার ক্লাবেও তারা মায়ের পূজা হচ্ছে।

মা কৌশিকী (কখনো কখনো অম্বিকা, মহাসরস্বতী বা চণ্ডিকা নামেও পরিচিতা) হলেন, যিনি মহাদেবীর যোদ্ধৃরূপ এবং অযোনিসম্ভবা শক্তি। দেবতাদের আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি পার্বতীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয় শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করার জন্যে।

মা তারা হলেন দেবী কালীর একটি বিশিষ্ট রূপ। ইনি দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। কালীর মতোই তারা ভীষণা দেবী। বৌদ্ধমতেও তারাদেবীর পূজা প্রচলিত। তারার মূর্তিকল্পনা কালী অপেক্ষাও প্রাচীনতর। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তারাপীঠে অবস্থিত দেবী তারার মন্দির বিখ্যাত। তিনি দেবী পার্বতীর এক উগ্র রূপ। বিখ্যাত তারা-সাধক হলেন বামাক্ষ্যাপা।

সল্টলেক এলাকার একমাত্র পটুয়া কার্তিক দাস এই বছর দুটি তারা মায়ের মূর্তি গড়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, তারা মা আর মা কালীর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তিনি বললেন, সমুদ্র মন্থনের সময় যে হলাহল নির্গত হয়েছিল, সেই হলাহল পান করেন মহাদেব। সেই হলাহলের বিষক্রিয়া থেকে মহাদেবকে স্তন্যপান করিয়ে উদ্ধার করেন তারা মা। তারা মায়ের ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত কিন্তু নিম্নাঙ্গ বসনাবৃত। তারা মায়ের পা দুটি খুবই মহত্ত্বপূর্ণ, তন্ত্রমতে তারা মায়ের যে রূপ কল্পনা করা হয়েছে সেখানে বিশেষ করে বলা হয়েছে, রত্নপাদুকায় পদদ্বয় শোভিত। তারা মায়ের পা আলাদা করে তৈরি করা হয়।

তারাপীঠে সতীর নয়নতারা পড়েছিল আর তার থেকেই তারাপীঠ নাম হয়েছে তবে মা তারার উদ্ভব নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে।

বৌদ্ধমতেও দেবী তারার উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধমতে আর্যতারা হলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবী যিনি মহাযান বৌদ্ধমতে একজন 'নারী বোধিসত্ত্ব' এবং বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম-এ একজন নারী বুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হন। বজ্রযান বৌদ্ধমতের পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের অন্যতম হলেন অক্ষোভ্য। তাঁর শক্তি হলেন তারা। তোড়ল তন্ত্র অনুসারে দেবী তারার ভৈরব হলেন— অক্ষোভ্য। বৌদ্ধমতে মা তারা হলেন অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের জন্মদাত্রী। দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা তারা মায়ের আটটি রূপ হলো— তারা (বামাকালী), উগ্রতারা, নীলসরস্বতী,একজটাতারা, তারিণীতারা, নিত্যাতারা, বজ্রতারা ও কামেশ্বরী তারা। মহাভারতে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দুর্গাস্তবে দেবী আরণীর উল্লেখ রয়েছে। তিনি জগতকে সকল বিপন্মুক্ত করেন। তিনি ত্রাণকর্ত্রী, তিনি সংসারিক ও আধ্যাত্মিক বিপদ থেকে সকল প্রাণীকে রক্ষা করেন। মা তারা অনেক রূপে প্রকাশিত হতে পারেন, যার মধ্যে সবুজ তারা এবং সাদা তারা বিশেষভাবে পরিচিত।

কৌশিকী অমাবস্যার পরের অমাবস্যায় হয় মহালয়া। অর্থাৎ দেবীপক্ষের শুরু আর তার পরের অমাবস্যায় হয় কালীপূজা। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন কৌশিকী অমাবস্যা মোটেই তারা মায়ের আবির্ভাব তিথি নয়। কালীপূজা যে অমাবস্যায় হয় সেটাই তারা মায়ের আবির্ভাব তিথি, তবে তন্ত্রমতে কালী আর তারা— দু'জন দেবীর পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

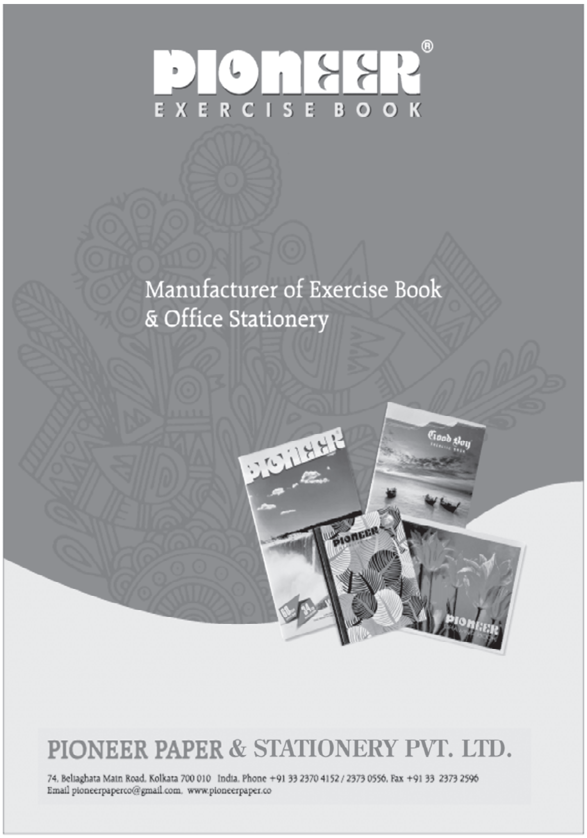

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT ☎ 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

সঙ্ঘকাজের কণ্টকাকীর্ণ পথে বঙ্গপ্রদেশের স্বয়ংসেবকরা

সুনীলপদ গোস্বামী

বর্তমানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রার্থনায় বলি 'কণ্টকাকীর্ণ মার্গম্'। এই কণ্টকাকীর্ণ পথে বঙ্গভূমিতে দীর্ঘ ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সঙ্ঘকাজ চলছে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় (দার্জিলিং), দক্ষিণে সাগর আর মাঝে অসংখ্য নদী-নালা। আমরা তপোভূমি নর্মদার কথা শুনেছি। নর্মদার তীরে বহু সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পশ্চিমবঙ্গও তাই। বহু সাধকের সাধনস্থল এই বঙ্গভূমি।

সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজী পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজীর জীবনের অনেকটা সময় পশ্চিবঙ্গে কেটেছে। মুর্শিদাবাদের সারগাছি আশ্রমে অনেকদিন থাকেন এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ শুরু করার জন্য ডাক্তারজী শ্রীগুরুজীকেই পাঠান। কিন্তু ডাক্তারজীর শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য কিছুদিন পরেই শ্রীগুরুজীকে নাগপুরে ফিরে যেতে হয়। কলকাতায় পাঠানো হয় বালাসাহেব দেওরসজীকে, যিনি পরবর্তীকালে তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক হন। কালিদাস বসু, সুনীলবরণ মুখার্জি, জয়দেব ঢোলে প্রমুখ শ্রীগুরুজী ও বালাসাহেবজীর সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ১৯৪০ সালে ডাক্তারজীর দেহাবসানের পর শ্রীগুরুজী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক হন। ফিরে যেতে হয় বালাসাহেব দেওরসজীকে। নাগপুরের সঙ্ঘকাজের মূল দায়িত্ব ন্যস্ত হয় বালাসাহেবজীর ওপর। ১৯৭৪ সালে রজ্জুভাইয়ার সঙ্ঘকাজে কলকাতার দায়িত্ব ঘোষণা হলেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা হওয়ায় তাঁকে আরও বড়ো দায়িত্ব দিয়ে দিল্লিতে পাঠানো হয়। পরবর্তীকালে রজ্জুভাইয়াও কলকাতার সঙ্ঘকাজের কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করেছেন। সুদর্শনজীও দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে বহুবার কলকাতায় এসেছেন। বর্তমান পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনজী সরকার্যবাহ হওয়ার পর তাঁর প্রথম কেন্দ্র হয় কলকাতা। অর্থাৎ সমস্ত সরসঙ্ঘচালকেরই কোনো না কোনো সময়ে এই বঙ্গভূমির সঙ্গে একটা নাড়ির টান গড়ে ওঠে।

১৯৩৯-৪৯ এই সময়কালে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ সর্বব্যাপী ছিল না। প্রথম শাখা শুরু হয় কলকাতায়। দেশবিভাজনের আগেই কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, নদীয়ার নবদ্বীপ, বর্ধমান ও মালদায় শাখা শুরু হয়। ১৯৪৭-এর আগে এখানে প্রচারক হিসেবে কাজ করেন নাগপুর থেকে আগত মনোহরলাল হরকরেজী, কালিদাস সালোটকরজী, মালদায় মুরলীধরজী। দেশ বিভাগের আগে শত শত যুবক শাখায় আসত। সেসময় পূর্ববঙ্গেও শাখা শুরু হয়। প্রচারক হিসেবে যান শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। সুকুমার ব্যানার্জি রাজশাহীতে সঙ্ঘকাজ বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেশবিভাগ রুখে দেবার জন্য পঞ্জাবের মতো বঙ্গের স্বয়ংসেবকরাও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সেসময় বঙ্গপ্রদেশের কাজের দায়িত্বে মনোহরলাল হরকরেজী। আজকে যেমন জেহাদি শক্তি, হিন্দু বিরোধী শক্তি এরাজ্যে সক্রিয়তা দেখাচ্ছে, সেই সময়েও কিন্তু একই চিত্র ছিল। তখন সুবিধাবাদী-সেকুলারপন্থী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং মুসলিম লিগ তথা জেহাদি শক্তি সক্রিয় ছিল ইংরেজরা তাদের মদত দিত। দেশ-বিভাগের প্রাক্কালে শ্রীগুরুজী যেমন অনবরত ভ্রমণ করেন, বঙ্গপ্রদেশের তৎকালীন প্রান্তপ্রচারক মনোহরলালজীও এরাজ্যের বহুস্থানে অনবরত ভ্রমণ করেন। পূর্ববঙ্গের বহু প্রবুদ্ধ নাগরিকের সঙ্গে দেখা করে দেশবিভাজন সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তখন বুদ্ধিজীবী, প্রবুদ্ধ হিন্দু সমাজ এক নির্লিপ্তভাব দেখিয়েছিল--- তার পরিণাম ১৯৪৬ সালে কলকাতায় এক ভয়াবহ জেহাদি আক্রমণ। সুরাবর্দির লক্ষ্য একটাই, সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। সেই সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং অন্যান্য রাজনৈতিক এবং কিছু অরাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্দোলনের ফলেই হিন্দু বাঙ্গালিদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়।

১৯৪৭-৫৭ অবধি দেশবিভাজনের ফলে বঙ্গ ও পঞ্জাবের অর্ধেকের বেশি জায়গা চলে যায় পাকিস্তানে। বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘের কাজ তখন সবেমাত্র ১০ বছরে পা রেখেছে। তখনই গান্ধীহত্যার মিথ্যা অপবাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ফঃ ৬

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,
ফোন ঃ ৭০৪৪০৯২০০০
২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ৮৪২০০৭০৯৫৯

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ৭০৪৪০৮৮৪০৮

বেহালা ঃ ৩৬৩, ডায়মন্ড হারবার রোড, ১৪ নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন - ৮৯৮১০০৬৫০০

কাঁচড়াপাড়া ঃ ৬৯/ডি, বাগ স্টেশন রোড, বাগ মোড়, কাঁচড়াপাড়া-৭৪৩ ১৪৫
ফোন ঃ ৭০৪৪০৬২০০০, ২৫৮৫ ৩৩৩৩

বারাসত ঃ ৫৬, কে এন সি রোড, হরিতলা, ফোন ঃ ৭০৪৪০৫০১৩৭

এবং বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, তমলুক, মেদিনীপুর।

স্বয়ংসেবকরা এই নিষেধাজ্ঞাকে ভয় করেনি। খুব অল্প স্থানেই তখন সঙ্ঘের কাজ। কিন্তু সেইসময় বরিষ্ঠ প্রচারকদের নেতৃত্বে সারা ভারতের সঙ্গে এরাজ্যের স্বয়ংসেবকরাও জেলে যায়। সত্য কোনোদিন পরাজিত হয় না। গান্ধী হত্যার কারণে সারা ভারতে চুয়াল্লিশ হাজার স্বয়ংসেবক সত্যাগ্রহ করেছিলেন। কংগ্রেস সরকার পরবর্তীকালে সঙ্ঘের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় সক্রিয় ভূমিকা নেন জ্ঞানচন্দ্র সান্যাল (গোরাদা), সুনীল মুখার্জি, সুকুমার ব্যানার্জি, রামপ্রসাদ দাস, সীতানাথ গোস্বামী, কালিদাস বসু, অহীন্দ্রকুমার দে প্রমুখ কার্যকর্তা।

নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর পূর্বক্ষেত্রের ক্ষেত্র প্রচারক হিসেবে এলেন একনাথ রাণাডে। তখন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অসম ও ওড়িশাও ছিল। পূর্বাঞ্চলে সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য তিনি মধ্যপ্রদেশের বিভাগ প্রচারক অমলকুমার বসুকে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক করে নিয়ে এলেন। অমলদা ১৯৪৯-এ আসার পর কখনো প্রান্ত প্রচারক, কখনো প্রান্ত কার্যবাহ, কখনো প্রান্ত সঙ্ঘচালক রূপে এরাজ্যের স্বয়ংসেবকদের পথনির্দেশ করেন এবং এরাজ্যে সঙ্ঘকাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেসময় (১৯৫০) এলেন কেশবরাও দীক্ষিত। মধুকর লিমায়ে গেলেন অসমে। গৃহী কার্যকর্তারূপে উল্লেখযোগ্য কাজ করেন বসন্তরাও বাপট। মধ্যপ্রদেশে পড়াশোনা শেষ করে পশ্চিমবঙ্গকে কর্মজীবন হিসেবে বেছে নেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একজন আদর্শ গৃহী কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এরাজ্যের কাজকে বাড়ানোর জন্য আরও অনেক গৃহী কার্যকর্তা এই কলকাতায় কাজ করেন। উল্লেখযোগ্য মানিকতলার শ্যামচাঁদ মল্লিক প্রমুখ।

দেশবিভাজনের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে যে সমস্ত হিন্দু এদেশে চলে আসছে, তাদের সহায়তার জন্য একনাথজীর নেতৃত্বে তৈরি হলো বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি। শ্যামচাঁদ মল্লিক বাস্তুহারা সহায়তার সমিতির মাধ্যমে সেবাকাজ করেন, সঙ্গে ভোঁওরলালজী। রাজস্থানের বাসিন্দা কলকাতার বহু স্বয়ংসেবক এখনও ভোঁওরলালজীর কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। শিব ভগবান বাগেড়িয়াজী, যুগলকিশোর জৈথেলিয়াজী-র মতো শত শত গৃহী কার্যকর্তার অবদান অনস্বীকার্য এই রাজ্যে সঙ্ঘকাজকে পুষ্ট করার জন্য। ১৯৫০-এর পর কলকাতায় এলেন বসন্তরাও ভট্ট। কণ্টকাকীর্ণ পথ কেমনভাবে সুগম করতে হয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন বসন্তরাও ভট্ট। পরবর্তীকালে কল্যাণ আশ্রমে গিয়ে সেখানকার কাজ দাঁড় করান। দুইভাই বংশীলাল সোনী ও অনন্তলাল সোনী সম্পর্ক করেন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে যিনি পরবর্তীকালে রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্যামমোহন দে (স্কুল শিক্ষক ছিলেন) প্রমুখ পরবর্তীকালে এরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন। রথীনদার (রথীন চক্রবর্তী) কথা সবাই স্মরণ করে। বিষম পরিস্থিতিতে তাঁরা দশ হাতে আগলে রেখে ওইসব স্থানে সঙ্ঘকাজ বিস্তার করেন।

১৯৫৭-১৯৬৭—পশ্চিমবঙ্গে অনেক বিষয়ে পটপরিবর্তন হয়। ১৯৫৭ সালে গোরক্ষা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনে স্বয়ংসেবকেরা বড়ো ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬২ সালে যুদ্ধের সময় চীনা আক্রমণ এবং এখানকার কমিউনিস্টদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করেন স্বয়ংসেবকরা। বোমডিলা, তেজপুর, অসমের বিভিন্নস্থানে চীনা আক্রমণের সময় তাঁরা ট্রাফিক পুলিশের কাজ করেন। সেনাবাহিনীকে রক্তদান, ওষুধ ও খাবার পাঠানোর কাজে স্বয়ংসেবকরা অগ্রণী ভূমিকা নেন। ১৯৬৫-র যুদ্ধেও স্বয়ংসেবকরা পিছিয়ে থাকেননি। তখন সব জেলায় সঙ্ঘকাজ শুরু হয়েছে। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে যুদ্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকরা বিভিন্নভাবে ওইসময় সক্রিয় ছিলেন। ১৯৬২ সালে যে বামপন্থীরা চুপ হয়ে যায়, তারা ৫-৭ বছর পর আবার সংগঠিত হয়। শুরু হয় নকশাল বাড়িতে মাওবাদী আন্দোলন, যার লক্ষ্য সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া। অনেক স্থানে শাখার ওপর হামলা হয়। কিন্তু চারু মজুমদার, কানু সান্যালের নকশালবাড়ি আজ সঙ্ঘের দুর্গ। সেখানে জনমানসে হিন্দুত্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সেসময় কিন্তু সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গও হয়। সেসময় বঙ্গের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে বিহার, অসম, ওড়িশার স্বয়ংসেবকরা আসতেন। বালাসাহেবজীর ছোটোভাই ভাউরাউজী ছিলেন ক্ষেত্র প্রচারক। ১৯৭০ সালে ভাউরাউজীর আহ্বানে দেশ-ধর্ম-সমাজ রক্ষার জন্য বহু সাধুসন্ত সারা ভারতকে পথ দেখান। এরাজ্যের কাজের জন্য বাইরে থেকে কেন প্রচারক আসবে? এখানকার প্রচারক চাই। এই আহ্বানে তৎকালীন প্রান্ত সঙ্ঘচালক কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী (মাস্টার মশাই)-র বড়ো ছেলে অরুণ কুমার চক্রবর্তী প্রচারক বের হন। ১৯৭১ সালে তিনি প্রচারক হিসেবে মালদা যান। রাধাগোবিন্দ পোদ্দার কলকাতা থেকে প্রচারক বের হয়ে হুগলী এবং পরে মালদায় যান। শ্যামলাল ব্যানার্জি কলকাতা থেকে প্রচারক বের হন। শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রচারক পরম্পরা। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় অত্যাচারিত হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। ভারতবর্ষের জওয়ানদের জন্য বাংলাদেশের জন্ম। বনগাঁ সীমান্তে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির মাধ্যমে হাজার হাজার পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ক্যাম্প হয়েছিল বেনাপোতায়। সেসময় কলকাতায় প্রচারক রতনদা (বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য) মূলত বাঙ্গালি কিন্তু বড়ো হন দিল্লিতে। তাঁর সঙ্গে শ্যামচাঁদদা, রতনদা, গজানন বাপটজী বনগাঁর মতো দুর্গম স্থানে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন।

উত্তরবঙ্গের হিলি সীমান্তে, মালদা সীমান্তে জওয়ানরা যুদ্ধে যাবার সময় এবং জয় করে ফেরার সময় বংশীদার নেতৃত্বে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। সমাজ যখন কষ্টে পড়েছে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কোনোদিন পিছপা হননি—এগিয়ে এসেছেন। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় রাগ পড়ল বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সঙ্ঘের ওপর। মধ্যরাতে কার্যালয় সিল করে দেওয়া হয়। বিরোধী নেতাদের জেলে ভরা হয়। আজ অসহিষ্ণুতার কথা বলেন অনেকে। অসহিষ্ণুতা কী জিনিস তা জানতে হবে কংগ্রেসের কাছ থেকে। তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেবজীকে জেলে বন্দি করা হয়। শুরু হলো বিরোধীদের ওপর অত্যাচার। ননী পাল্কিওয়ালা লিখেছেন— ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভারতের সংবিধানে 'সেকুলার' শব্দ ছিল না। ৪২তম সংশোধনী করে, বিরোধীদের জেলে ভরে, সমস্ত সামাজিক সংগঠনকে রুদ্ধ

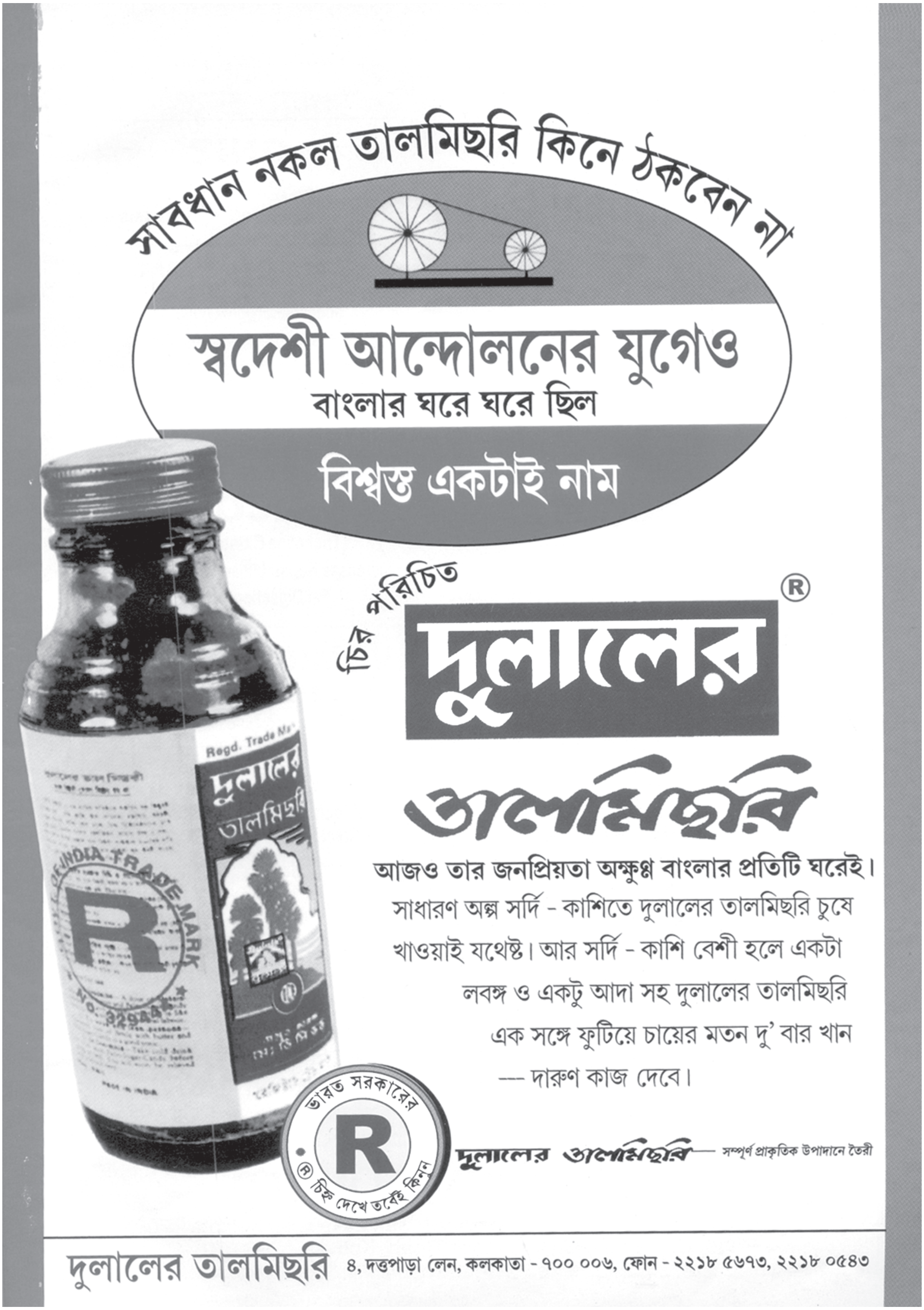

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান --- দারুণ কাজ দেবে।
Regd. Trade Mark
দুলালের তালমিছরি
ভারত সরকারের ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

করে রাতের অন্ধকারে সেকুলার ও সোশ্যালিস্ট শব্দ দুটি সংবিধানে প্রবেশ করানো হয়। আজও তার পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৭ সালে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর সারা ভারতের সঙ্গে এরাজ্যের কাজও বাড়তে থাকে। ১৯৭৭-৮৭ এই কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের ব্যাপক বিস্তার হয়। জেলায় জেলায় তো কাজ ছিলই। এই কালখণ্ডে মহকুমা এবং খণ্ড স্তর পর্যন্ত সঙ্ঘের কাজ বাড়তে শুরু করে।

১৯৮৩ সালে হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করার জন্য একটি ভাবাত্মক একাত্মতা রথযাত্রা হয়। কলকাতার ওপর দিয়ে একটি রথ যায়। এপ্রসঙ্গে মোরপন্থ পিংলেজীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসন। তারা জঘন্যরূপে এই রথযাত্রার বিরোধিতা করে। কিন্তু তারা কেউ আটকাতে পারেনি। মাইকে করে জনসাধারণের উদ্দেশে এই রথযাত্রা বয়কট করার আহ্বান জানায়। কিন্তু কোচবিহার থেকে চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন। এরপর এরাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে সঙ্ঘ কাজের আরও বিস্তার হয়। অনেক জেলায় সঙ্ঘের ১০০-র বেশি শাখা হয় তার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, উ: ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর।

১৯৮৭-১৯৯৭—এই দশ বছরে আমাদের কণ্টকাকীর্ণ পথের অনেক কণ্টক দূর করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। ১৯৮৬ সালে যখন শ্রীরামজন্মভূমির তালা খুলে গেল, যখন শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির আন্দোলন শুরু হলো—সেই আন্দোলনের কত বিরোধিতা হয়েছে। যারা সেদিন বিরোধিতা করেছিল আজ তারা কোথায়? যে লালুপ্রসাদ যাদব বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁকে জেলে বসে রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন দেখতে হলো। যে মুলায়ম সিংহ গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিল, যে গুলিতে কলকাতার ১৮-২০ বছরের যুবক রাম কোঠারী ও শরদ কোঠারী 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' ধ্বনি দিয়ে গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই মুলায়মকেও ঘরে বসে দেখতে হয়েছে যে রামমন্দিরের শিলান্যাস হচ্ছে! লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সেদিন গর্জে উঠেছিল।

১৯৩৯ সালে বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ শুরু হয়, তার ৫০ বছর পর ১৯৮৯ সালে ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষের সময় কলকাতায় গড়ে উঠল 'কেশবভবন'--- প্রান্ত কার্যালয়। তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী এর উদ্বোধন করতে আসেন। এসেছিলেন সেইসব প্রচারকেরা, যাঁরা একসময় বঙ্গপ্রদেশে সঙ্ঘকাজ করেছিলেন। তখন ক্ষেত্র প্রচারক শ্রীকৃষ্ণরাও মোতলগ। ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে বালাসাহেবজী আহ্বান করেন পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজ বিস্তারের জন্য এরাজ্যের যুবকরা প্রচারক বের হোক। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এরাজ্য থেকে ১১১ জন প্রচারক বেরোয়। এঁদের মধ্যে আজও অনেকে প্রচারক জীবন পালন করছেন। কেউ কেউ অসম, ত্রিপুরা, পঞ্জাব ও দিল্লিতে গেছেন। যে বঙ্গে একসময় বাইরে থেকে প্রচারক আসতেন, সেই বঙ্গের প্রচারকরা সমর্পিত মন নিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গেছেন। এরাজ্যের চারজন কার্যকর্তা---শ্যামল সেনগুপ্ত, দীনেন দে, সুধাময় দত্ত, কাঞ্চন চক্রবর্তী—ত্রিপুরা থেকে অপহৃত এবং নিহত হন। আমরা এঁদের ভুলতে পারি না। আজকে অসমে যে হিন্দুত্বের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তার পেছনে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসেবকদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

সঙ্ঘের ওপর অত্যাচার সবসময় হয়েছে। ১৯৪৮, ১৯৭৫ এবং ১৯৯২ সালে তিন-তিনবার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও কিন্তু স্বয়ংসেবকরা পিছপা হননি। ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একটি মাত্র সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হতো, এখন সেখানে চারটি সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ হচ্ছে। কার্যকর্তা নির্মাণ হচ্ছে। পরিস্থিতি বিরুদ্ধ থাকলেও আমরা কার্যকর্তা নির্মাণের মাধ্যমে নবনির্মাণের কাজে সময় দিতে পেরেছি, আমরা পিছিয়ে পড়িনি। হিন্দু সমাজকে জাগ্রত করার জন্য আমরা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করেছি। কল্যাণী মহাশিবিরে (১৯৯২) ১৮ হাজার স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে তিনদিন উপস্থিত ছিলেন। সারা ভারতের কাছে এটি একটি উদাহরণ।

১৯৯৭ থেকে ২০০৭---এই কালখণ্ডে আমাদের প্রদেশে সঙ্ঘকাজের অনেক বিস্তার হয়েছে। আমরা সুদূর আন্দামানেও সঙ্ঘের কাজের বিস্তার করেছি। আমরা সিকিমের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চলে শাখা শুরু করেছি। ২০০৫ সালে আন্দামানে সুনামি হয়। সেসময় সেখানে সঙ্ঘ যে সেবাকাজ করে তা আজও সেখানকার হিন্দু সমাজ নতমস্তকে স্মরণ করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বয়ংসেবকরা বিভিন্ন দ্বীপে যান সেবাকাজ করতে।

২০০৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ একটি প্রান্ত ছিল---দক্ষিণে সমুদ্র থেকে উত্তরে সিকিম, উত্তর পূর্বে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র। সেসময় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী। মাননীয় সরকার্যবাহ ডাঃ মোহনরাও ভাগবত পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকাজের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের জন্য দুটি ভাগ করার প্রস্তাব দেন। প্রস্তুতি আমাদের ছিল। উত্তরবঙ্গে কাজের বিস্তারে বংশীলাল সোনী এবং ডাঃ দেবব্রত সিংহের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। গণেশ দেবশর্মা ছিলেন উত্তরবঙ্গের কাজের জন্য সমর্পিত জীবন। তিনবিঘা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন মনমোহন রায়। বামপন্থীরা তিনবিঘা আন্দোলনকে ভেঙে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। দক্ষিণবঙ্গে সাড়ে ৮ কোটি জনসংখ্যা। এখানেও কাজের বিস্তার ও দৃঢ়ীকরণের জন্য অনেক চিন্তাভাবনা করে ২০২১ সালে দু-ভাগে বিভক্ত হয়—দক্ষিণবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গ। কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ আর হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ নিয়ে মধ্যবঙ্গ।

আমাদের প্রদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বড়ো বড়ো কার্যক্রম হয়েছে। বঙ্গপ্রদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অশুভ শক্তি ছিল। দেশবিভাগের সময় তিনটি অশুভ শক্তি ছিল---মুসলিম লিগ (জেহাদি শক্তি) তাকে সমর্থন করল রাষ্ট্রবিরোধী বামশক্তি আর তাকে সমর্থন করে কুচক্রী সেকুলার শক্তি। দেশ বিভাজন হয় জাতির ভিত্তিতে। মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকবে না---এই দাবিতে পাকিস্তান তৈরি হয়। কিন্তু আমরা দেখলাম জনবিনিময় পঞ্জাবে হলো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হলো না। ১৯৬৭-২০১০ পর্যন্ত ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ হলো পশ্চিমবঙ্গে--- কোটি কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে এখন আবার যোগ দিয়েছে রোহিঙ্গা মুসলমানরা। তারা এখন আবার হিন্দুদের আক্রমণ করছে।

With Best Compliment From

Our Services

- Patent
- Copyright
- Trademark

itag
POWER OF IDEAS

Your IP Partner
ITAG BUSINESS SOLUTIONS LTD
+91 80170 37767

With Best Compliments from :

Maliram Singhania Charitable Trust

7B, Kiransankar Roy Road
2nd Floor, Kolkata - 1

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

P-31, CIT Road, Sch. VIM (S) Phoolbagan
(Near Phoolbagan Metro Station), Kolkata - 700 054
M. - 8910331350

৩৪ বছরের বাম শাসন হিন্দুশক্তিকে হীনবল করার ষড়যন্ত্র সুচারুরূপে করেছিল। ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তন হলো। তখন তারা বড়ো বড়ো আশ্বাস দিয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল, যে ভুল আগের শাসকরা করেছিল, তারাও একই ভুল করল। জেহাদি শক্তিকে এরাও প্রশ্রয় দান করল। এর পরিণামে দেখলাম রামনবমী উৎসবের বিরোধিতা, সরস্বতী পূজায় বিরোধিতা, দুর্গাপূজায় বিধিনিষেধ, বিসর্জনে বিধিনিষেধ, 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির বিরোধিতা। কিন্তু এর ফল হলো উলটো। 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিকে সামনে রেখে হিন্দু সমাজ জাগ্রত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হলো। এটি একটি বড়ো প্রাপ্তি। সামাজিক জাগরণ। ১৯৩৯ থেকে ২০২১---প্রায় ৮১ বছরে যেটি হয়নি সেটিই হলো—হিন্দু শক্তির রাজনৈতিক উত্থান—যা দেখে রাষ্ট্রবিরোধীরা ঘাবড়ে গেল। তারা ঘাবড়ে গিয়ে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের পথ বেছে নিল। এই যে হিন্দুশক্তির উত্থান—যেটা ১৯৪৭ সালে হয়নি, যেটা ১৯৭৫ সালে হয়নি, যেটা ১৯৯০ সালে হতে পারেনি—সেটা ২০১৯ সালে হলো— একটি রাজনৈতিক সচেতনতা জাগ্রত হলো। চল্লিশ শতাংশ মানুষ একপক্ষে মত পোষণ করল---সংগঠিত হিন্দুশক্তি। এই বিষয়টা রাষ্ট্রবিরোধীদের মনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করল। ফলে যারা মুখে 'গণতান্ত্রিক', 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইত্যাদি শব্দ বলে, তারা জেহাদি শক্তির সঙ্গে হাত মেলাল। আমরা দেখলাম, যারা ২০ বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে, যারা ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করেছে, সেই দুটি রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে জেহাদিশক্তির সঙ্গে হাত মেলাল। তৃণমূল দলও জেহাদি শক্তিকে কাছে পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে বলা শুরু করল— পশ্চিমবঙ্গে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বসবাস করার ব্যবস্থা করা হবে, পশ্চিমবঙ্গে সিএএ-র বিরোধিতা করা হবে, এখানে যারা শ্রীরামের কথা বলবে তাদের নিয়ে খেলা হবে। এক অদ্ভুত খেলা ২০২১-এর ২ মে'র পর থেকে আমরা দেখছি। বর্তমান সময় সঙ্কটময়। বর্তমানের পথও কণ্টকাকীর্ণ। ডাক্তারজী যে চিন্তা নিয়ে ১৯৩৯ সালে শাখা শুরুর জন্য জন্য শ্রীগুরুজীকে বঙ্গভূমিতে পাঠিয়েছিলেন, যাঁরা নানাসময় আমাদের পথনির্দেশ করেছিলেন, যাঁরা কণ্টকাকীর্ণ পথে কাজ করছেন— তাঁরা অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন।

এই কণ্টকাকীর্ণ পথকে আমরা সুগম করব। বঙ্গভূমি একসময় সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে। আমাদের মহাপুরুষ ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, মাস্টারদা সূর্য সেন— তাঁদের বংশধর আমরা। তাঁরা হিন্দুসমাজকে জাগ্রত করার জন্য কাজ করেছেন। 'ওই দেখ চেয়ে নতুন সূর্য'— এই গান আমরা সঙ্ঘের শাখায় গাই। আমরা সবাই তাকিয়ে আছি সেই নতুন সূর্যের দিকে। তাই কবি গেয়েছেন—'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শির নাহি ভয়।'

আমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা নিজেদের তন-মন-ধন সমর্পণ করে আমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন---তা ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য—সেই পথ সবসময় কণ্টকাকীর্ণ। তাঁরা জেলকে ভয় পাননি, তাঁরা পুলিশকে ভয় পাননি, তাঁরা আক্রমণকে ভয় পাননি। আদর্শের জন্য তাঁরা নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে গেছেন। তাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে উদাহরণ দাঁড় করিয়ে গেছেন। আসুন, আমরা সবাই মিলে সেই পথকে আরও প্রশস্ত করি।

(লেখক অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য)

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street

4th Foor, Kolkata - 700 069

Phone : Nos. 22483203

Fax No. 22483195

Email : eita.cal@eitain.com

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৩৮)

শুভারম্ভ

ফুলগাছে যখন একটি কুড়ি আসে, ঠিক তখনই তা প্রস্ফুটিত হয় না। এই প্রস্ফুটনের প্রেক্ষাপট, অনেক ক্রিয়া, প্রক্রিয়া, অনুভূতির তরঙ্গ অনেকটা সময় ধরে তৈরি হতে থাকে তা আমরা দেখি না; এক সময় হঠাৎ দেখি প্রস্ফুটিত একটি ফুল।

ডাক্তারজীর মনেও এমন বহু তরঙ্গের উথালপাথাল এক বৃহত্তর কর্মের প্রেক্ষাপট তৈরি করে যাচ্ছিল, তার অনেকাংশই ছিল সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। ইতিমধ্যে খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'হিন্দু মুসলিম ঐক্যের' দুর্দশা তিনি অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার দেখলেন— ১৯২৪ সালের ১২ ও ১৩ জুলাই ইদ ও আষাঢ় একাদশী একসঙ্গে পড়েছিল। মুসলমানরা আবার হিন্দুদের ওপর আক্রমণের উদ্যোগ নিল কিন্তু ডাক্তারজী ও ডাঃ মুঞ্জের সতর্কতায় সর্বত্র লাঠিধারী পাহারা, মুসলমান মহল্লা থেকে আগেই হিন্দুদের সরিয়ে আনা এবং সকলকে সজাগ ও প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকার ব্যবস্থা করায় তেমন কিছু করতে পারেনি। বরং মুসলমানদের কাছ থেকে সবজি, ফল কেনা বয়কট করে তাদের উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর কোহাটের আক্রমণে প্রায় একশো পঞ্চাশ জন হিন্দু নিহত হয়, ৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়।

'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের' গালভরা বাক্যের এই পরিণতিতে নেতারা কিন্তু এবার সত্যকথা পরিষ্কার ভাবে বলতে লাগলেন। সরোজিনী নাইডু গান্ধীজীকে লিখলেন— 'শান্তির ভাষণ ও প্রবচন ঢের হয়েছে'। ডাঃ আম্বেদকর লেখেন— 'একতা পরিষদে কেবল লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং সেগুলি ঘোষণা হবার পরমুহূর্তে তার উল্লঙ্ঘনও শুরু হয়ে যায়'। এতে গান্ধীজী বিচলিত হলেও তাঁর চিন্তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। হিন্দুদের উদ্দেশে তিনি বললেন— 'আমার কথা কে শুনছে? কিন্তু এ সময়ে আমি হিন্দুদের একথাই বলবো যে তোমরা মরে যেতে পারো কিন্তু মেরো না'। মোপলা আক্রমণের পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন ও সঙ্ঘবদ্ধতার কাজ শুরু করেছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এ বিষয়ে বললেন— 'হিন্দুদের মধ্যে যদি ভীরুতা ও দুর্বলতা না থাকতো, তাহলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনেক গণ্ডগোল এড়ানো যেত। এই দাঙ্গার ফলে দেশের মধ্যে যে ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য অনেকাংশে দায়ী হিন্দুদের দুর্বলতা, তা দূর করা আবশ্যক'।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামি ইতিহাস ও ইসলামি আইন অধ্যয়ন করে যা অনুভব করলেন, তার নির্যাস রূপে লালা লাজপত রায়কে জানালেন— 'আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান একতা সম্ভব নয় এবং ব্যবহারিকও নয়'। স্বামী সত্যদেব পরিব্রাজক তাঁর লিখিত ভাষণের শেষাংশে বললেন— 'হিন্দুরা মুসলমান গুন্ডাদের ভয়ে ভীত, তাদের এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য হিন্দুদের সংগঠন অবশ্য করা উচিত'। ডাক্তারজীর মনেও এই কথারই উথালপাথাল চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এবার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তিনি পরিভ্রমণ শুরু করলেন। শ্রীভাউজী কাওরে, আপ্পাজী যোশী, বিশ্বনাথরাও কেলকর প্রমুখ বন্ধুদের এবং মধ্যপ্রান্তের রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের নিয়ে কয়েকবার বৈঠক করেন, তাদের মতামত জানেন। জানতে চান কোন পদ্ধতিতে এই সংগঠন গড়ে তোলা ঠিক হবে। দীর্ঘ বিচার বিমর্শের পরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে ভারতবর্ষের উত্থানের জন্য সে সমাজ নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছে, তা এই দেশের হিন্দু সমাজ। এই হিন্দু সমাজ মুসলমান বা ইংরেজদের জন্য অধঃপতিত হয়নি, রাষ্ট্রীয় চরিত্র বিস্মৃত হওয়ার দরুন হিন্দুদের এই দুর্দশা। তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন— হিন্দু সমাজকে অনুশাসনবদ্ধ ও সঞ্জীবিত করে দেশকে পুনরায় বৈভবসম্পন্ন রাষ্ট্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণে ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর পবিত্র দিনে তিনি তার নিজ গৃহে শুভ সূচনা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। পনেরো-বিশ জন ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে একত্রিত করে সকলের সামনে ঘোষণা করলেন— 'আমরা আজ থেকে সঙ্ঘ শুরু করছি'।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস